চলচ্চিত্রের আবির্ভাব

জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়

●

১৯এ, কেদার বসু লেন,
কলকাতা-৭০০০২৫

প্রকাশক : রমা বন্দ্যোপাধ্যায়
শশধর প্রকাশনী
১৯এ, কেদার বসু লেন
ভবানীপুর, কলকাতা-৭০০০২৫

প্রকাশকাল : ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৯

সম্মুখ প্রচ্ছদ : পূর্ণেন্দু পত্রী

অন্যান্য অলংকরণ : অসিত বেরা

পশ্চাৎ প্রচ্ছদ : মডার্ণ টাইমস্

মুদ্রণ অমল বন্দ্যোপাধ্যায়
মৌ প্রেস
১৯এ, কেদার বসু লেন
কলকাতা ৭০০০২৫

"Amer savoir, celui qu'on tire du voyage !
Le monde, monotone et petit, aujourd'hui,
Hier, demain, toujours, nous fait voir notre image :
Une oasis d'horreur dans un désert d'ennui !

Faut-il partir ? rester ? Si tu peux rester, reste ;
Pars, s'il le faut. L'un court, et l'autre se tapit
Pour tromper l'ennemi vigilant et funeste,
Le Temps ! Il est, hélas ! des coureurs sans répit,"

—Baudelaire : La Mort-vii

মুখবন্ধ

এ লেখা তৈরি করতে সময় লাগল অনেক। চলচ্চিত্র ইতিহাস সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় বই পাওয়া আমার পক্ষে বিশেষ সহজসাধ্য ছিল না।

এই বইকে পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস হয়ত বলা যাবেনা, তবু মূল ঘটনাবলী—এক্ষেত্রে আবিষ্কার এবং আবিষ্কারের অনুষঙ্গ এবং প্রচ্ছন্ন সামাজিক-অর্থনৈতিক প্রভাব যতদূর সম্ভব ক্রমানুযায়ী রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলে রাখা ভাল। বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার সময়কাল সম্পর্কে বিভিন্ন বইতে বিভিন্ন রকম সন-তারিখের উল্লেখ পাওয়া যায়। সবচেয়ে বেশী সংখ্যক বইতে যে সন-তারিখ নেওয়া হয়েছে আমি সেটাই গ্রহণযোগ্য মনে করেছি। আবার একাধিক দেশ একই আবিষ্কারের কৃতিত্বের অগ্রাধিকার দাবী করছে—এ নজীরও আছে। অনেক ক্ষেত্রেই খুঁটিনাটি ঘটনা, যা মূল আবিষ্কারের পশ্চাদভূমি বলা যেতে পারে, বর্জন করতে হয়েছে বই এর আকৃতি এবং মূল্য সম্পর্কে ভেবে। সাধারণতঃ এ জাতীয় বই এর আকাশ ছোঁয়া দাম সংগ্রহের সাধ আর সাধ্যের ব্যবধান বাড়ায়।

পঞ্চাশের দশকের পর থেকে আমাদের দেশে চলচ্চিত্র সম্পর্কে উৎসাহ উদ্দীপনার প্রবণতা ক্রমশ বেড়েই চলেছে। ছবি দেখা বোঝা, ছবি সম্পর্কিত লেখা এমন কি নির্মাণের জন্যও ইতিহাস চেতনার প্রয়োজন আছে এরকম মনে হয়। সে ব্যাপারে এই বই কোন প্রয়োজনীয় ভূমিকা নিতে পারলে আমার শ্রম সার্থক।

চলচ্চিত্রের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস সামাজিক অর্থনৈতিক বিবর্তনের ইতিহাস। বৈজ্ঞানিক প্রয়োগ বিদ্যার ক্রমোন্নতির ইতিহাস। সামাজিক অর্থনৈতিক প্রভাব চলচ্চিত্র শিল্পকে ভীষণভাবে প্রভাবিত করেছে। পৃথিবীর সর্বকনিষ্ঠ অথচ সবচেয়ে শক্তিমান এই শিল্পমাধ্যমটি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে নিজের মধ্যে সামাজিক, অর্থনৈতিক, কারিগরী অবস্থার প্রতিফলন ঘটিয়ে

তার ইতিহাসের গতিপথ তৈরী করেছে। চলচ্চিত্র পরিণত হয়েছে পৃথিবীর অন্যতম এক বৃহৎ শিল্পে (industry)। সেই বিস্তারিত সম্পূর্ণতর ইতিবৃত্ত রচনার পরিকল্পনা রইল। সহৃদয় পাঠকের উৎসাহ ও সাড়া এই প্রয়াসের প্রেরণা যোগাবে, আশা করি।

অনবধানে কিছু মুদ্রণ প্রমাদ থেকে গেল। তার সম্পূর্ণ দায়িত্ব আমার। যে সমস্ত ভুল, তথ্যের বিভ্রান্তি ঘটাতে পারে সেগুলোর জন্যে একটা শুদ্ধিপত্র বই-এর শেষে সংযুক্ত করা হ'ল। সহানুভূতিশীল পাঠকের কাছে আমি অগ্রিম ক্ষমাপ্রার্থী।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

ক্যালকাটা সিনে ইন্‌স্টিটিউট লাইব্রেরী—শ্রীনির্মাল্য বসু, শ্রীবরুণ রায়, শ্রীতপন ভৌমিক। ন্যাশানাল লাইব্রেরী, ব্রিটিশ কাউন্‌সিল লাইব্রেরী—শ্রীদুর্গা ব্যানার্জী, অ্যামেরিকান সেণ্টার লাইব্রেরী। শ্রীদীলিপ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীতপন মাইতি, শ্রীমতী শিখা বেরা, শ্রীমতী নূপুর গুপ্ত এবং শ্রীঅপূর্ব রায়। সত্যজিৎ রায়ের আলোকচিত্র শ্রীনিমাই ঘোষের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

'চলচ্চিত্রের আবির্ভাব' প্রসঙ্গে ঃ—

বাংলা বইয়ের জগতে 'চলচ্চিত্রের আবির্ভাব' বইটির আবির্ভাবকে স্বাগত জানাই। বাংলা ভাষায় ঠিক এ ধরণের বই আছে বলে আমার জানা নেই। চলচ্চিত্র আমার নেশা ও পেশা হলেও, এ বইয়ের অনেক তথ্যই আমার অজানা ছিল।

আজ থেকে দশ বছর পরেও চলচ্চিত্র শিল্পগত ও কারিগরীগত কি রূপ নেবে, তা যেমন ভেবে দিশা পাওয়া যায়না, ঠিক তেমনই সুদূর অতীতের কোন বিশেষ ঘটনাটি অথবা কোন মনীষীর মনের ইচ্ছাটুকুই আজকের এই সর্বকনিষ্ঠ শিল্পের প্রথম বীজ, একথা ভাবতে বসলেও তল পাওয়া যায়না। ক্রমানুযায়ী এই সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করতে ও ধারাবাহিক-ভাবে সাজাতে লেখককে যে কত পরিশ্রম করতে হয়েছে তা সহজেই অনুমেয়।

আশাকরি এই বইটি আগ্রহী ও উৎসাহী পাঠকের প্রয়োজন মিটিয়ে তাঁদের সমাদের লাভ করবে।

সুব্রত মিত্র

'চলচ্চিত্রের আবির্ভাব'—এ চলচ্চিত্রের প্রযুক্তি তথা প্রয়োগরূপের বিবর্তনের প্রথম পর্বের যে বিবরণ রয়েছে, তার সঙ্গে জটিল সামাজিক-অর্থ-নৈতিক প্রেক্ষাপট এবং অন্য শিল্পরূপ সমূহের সমান্তরাল বিকাশের যোগা-যোগ ও লেনদেনের বৃত্তান্ত যুক্ত হলে চলচ্চিত্রের একটি পূর্ণতর ইতিহাস পাওয়া যেত। আসলে চলচ্চিত্রের মধ্যে নিহিত রয়েছে বহু প্রয়োগ বা প্রকাশকলাকে অবলীলায় আত্মস্থ করে ফেলার সহজাত ক্ষমতা। সেই ক্ষমতা চলচ্চিত্রের অন্যতম লক্ষণ বিশেষ। তাই এই 'অ-শুদ্ধ' কলারূপটির ইতিহাস রচনা এতটা কঠিন। এই চেষ্টায় আংশিক সার্থকতালাভও তাই অভিনন্দন যোগ্য।

শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়

চলচ্চিত্রের অনেক আগের কথা ছায়াছবি। ছায়াকে ছবি করে প্রতিষ্ঠা করার কথা যখন মানুষের চিন্তার জগতে প্রথম উঁকি দিতে শুরু করে, সেই সময় থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত এই অভাবনীয় উত্তরণের নেপথ্যে রয়েছে সাধারণ অসাধারণ বহু মানুষের নিরলস কর্মপ্রচেষ্টা। নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা, নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে জনশিক্ষার এই শক্তিশালী মাধ্যম আজ প্রতিষ্ঠিত; কিন্তু পরিপূর্ণ নয়। এই সুপ্রতিষ্ঠার নেপথ্যের ইতিহাস জানার আগ্রহ থাকলেও সঠিক নিশানা নেই। প্রযুক্তি বিদ্যা বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠ ফসল। কিন্তু সৃষ্টিকর্তা নয়। স্রষ্টার পদচিহ্ন ধরেই এগিয়ে চলে যুগ। স্রষ্টাকে না জানলে সৃষ্টি সম্পূর্ণ হয় না। শ্রীজগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়ের এই গ্রন্থটিতে সেই অনাস্বাদিত রস মাধুর্য্যের স্বাদ পাওয়া গেল। লেখার ভাষা সহজ সরল। সর্বসাধারণের পক্ষে সহজে বোধ্যগম্য। চলচ্চিত্রের উদগমনের সময় থেকে প্রায় মধ্য গগনের দেদীপ্যমান অবস্থার তথ্যমূলক ঘটনা আমাকে বিমোহিত করেছে। পুস্তকটি চলচ্চিত্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রতিটি ব্যক্তির কাছে অতি প্রয়োজনীয় জ্ঞানভাণ্ডার হিসেবে পরিচিত হবে। আর শুধু ছায়া ছবির জগতের লোকই নয়— বর্তমানের প্রতিটি শুভবুদ্ধিসম্পন্ন চিন্তাশীল ব্যক্তির কাছে জনশিক্ষার এই শ্রেষ্ঠ মাধ্যম সম্বন্ধে আগ্রহ থাকা স্বাভাবিক; তাই ছায়াছবি এবং তার বাইরে উভয় জগতের সর্বশ্রেণীর মানুষের কাছে পুস্তকটি তাদের জ্ঞান ভাণ্ডারে সংরক্ষণের মত একটি ঐতিহাসিক দলিল বলে আমি মনে করি।

প্রভূত পরিশ্রম করে লেখক সারা দুনিয়ার আলোকবিদ্যার যে ইতিহাস সংগ্রহ করেছেন, তার জন্যে অনুজপ্রতিম শ্রীজগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়কে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

দুলাল দত্ত

বাংলা ভাষায় চলচ্চিত্রের ওপর বেশি বই নেই। চলচ্চিত্রের ইতিহাস সংক্রান্ত কোন বই নেই বললেই চলে। অথচ চলচ্চিত্র তার জন্মলগ্নের কিছুকাল পর থেকেই এদেশে উপস্থিত। আশা করা যায় এ অভাব এবার পূরণ হবে এই বইখানির প্রকাশের মধ্য দিয়ে।

ইতিহাস পূর্ণাঙ্গ হওয়াই বাঞ্ছনীয়। লেখকের পরিকল্পনা রয়েছে সেই ইতিহাস লেখার। তবে সাবলীল ভাষায় লেখা এই সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত চলচ্চিত্রানুরাগীদের মধ্যে সাড়া জাগাবে, লেখকের এই আশা ন্যায় সঙ্গত বলেই আমরা মনে করি।

অজয় দে

[জেনারাল সেক্রেটারী, ফেডারেশন অফ্ ফিল্ম সোসাইটিজ অফ্ ইণ্ডিয়া। এশিয়ান রিপ্রেজেণ্টেটিভ, ইণ্টার ন্যাশানাল ফেডারেশন অফ্ ফিল্ম সোসাইটিজ।]

বিষয় সূচী

যদিও গ্রীক বৈজ্ঞানিক অ্যারিস্টটল (Aristotle : 384-322 B.C.) প্রথম দৃষ্টিবিজ্ঞানের ভিত্তি সম্পর্কে আলোকপাত করেন এবং আলোক-বিদ্যার বাস্তব পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন, তবুও আজ থেকে প্রায় পঁচিশ শতক আগে চীন দেশে, মো ৎজু (Mo Tzu) নামে এক দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থের আলোক সংবেদনশীলতা এবং দৃশ্যকে স্থায়ী করার সম্পর্কে চিন্তা করেছিলেন। অ্যারিস্টটলের পরে, আলেকজান্দ্রীয় বিজ্ঞানের যুগে, বৈজ্ঞানিক আর্কিমিডিস (Archimedes : 287-219 B.C.) প্রথম লেন্স ও আয়নাকে বৈজ্ঞানিক কাজে ব্যবহার করলেন। তিনি তৈরী করলেন বারনিং মিরার (Burning mirror) যার কার্যকারিতা উত্তল লেন্সের অনুরূপ।

আলেকজান্দ্রীয় বিজ্ঞানের যুগে, আর্কিমিডিসের সম-সময়ে, অ্যারিস্টটল এবং আর্কিমিডিসের আলোকবিদ্যা ও লেন্সের গবেষণার কথা গণিত শাস্ত্রের অধ্যাপক ইউক্লিডের (Uclid : 3rd Century B.C.) মনে বিশেষ আলোড়ন সৃষ্টি করল, এবং তিনি এ নিয়ে বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর দেখলেন যে, আলো সরল রেখায় গমন করে। ইউক্লিডের এই আবিষ্কারই ক্যামেরার মাধ্যমে ছবি তোলার মূল সূত্রের সন্ধান দিল পরবর্তী কালের বিজ্ঞানীদের।

খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে, আরব দার্শনিক আল হাজেন্ পূর্বসূরী চিন্তাশীল ব্যক্তিদের দৃষ্টি বিজ্ঞানের সূত্র ধরে গবেষণা করে দেখলেন—চোখ দিয়ে আমরা যা দেখি, চোখের দেখা শেষ হলেও আমাদের মস্তিষ্ক তাকে আরও কিছুক্ষণ ধরে রাখে। অর্থাৎ আলহাজেন্ প্রথম 'অবিরত দৃষ্টিতত্ত্বের' (Persistence of vision) স্বপক্ষে গবেষণার একটা পথ দেখান, যার ফলে পরবর্তীকালের বিজ্ঞানীরা গতিশীল ছবি উদ্ভাবনের সূত্রের সন্ধান পান।

ছায়ার খেলার ইতিহাস থেকে জানা যায়, শুধুমাত্র চিত্তবিনোদের জন্যই ছায়ার খেলা দেখানোর প্রচলন হয়। চীন, ভারতবর্ষ ও জাপানেই

প্রথম এর সূত্রপাত ঘটে। প্রথম দিকে ছায়ার খেলার পাত্রপাত্রী তৈরী হোত বড় গাছের পাতা ও জন্তু-জানোয়ারের চামড়া দিয়ে।

পর্দার পিছনে থাকা জোরালো আলোর সামনে ছোট ছোট কাহিনীর ছায়ারূপ দেখানোর চেষ্টা করা হ'ত। ছায়ার খেলার মধ্যে বৈচিত্র্য আনার জন্য কোথাও কোথাও রঙীন ছায়ার খেলার প্রচলন ছিল।

এশিয়ার ছায়ার খেলা যখন ইউরোপের বিভিন্ন দেশে প্রসার লাভ করলো তখন দস্তা, তামা, পিতল ইত্যাদি আবিষ্কার হয়ে গেছে। এর ফলে ইউরোপের ছায়ার খেলার পাত্রপাত্রীরা তৈরী হ'ল আরও নিখুঁত-ভাবে এবং যান্ত্রিক উপায়ে খেলা দেখানোর প্রবর্তন হ'ল।

ছায়ার খেলা যখন বেশ উন্নত হয়েছে, তখন পরপর বেশ কয়েকটা ঘটনা ঘটে গেল। ইটালীর স্বর্ণযুগের কর্ণধার, চিত্রশিল্পী, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক লিওনার্দো দা ভিঞ্চি (Leonardo da Vinci : 1452-1519), প্রথম 'ক্যামেরা অবস্কিউরা'র (Camera obscura) বর্ণনা দিলেন। এর পিছনে গ্রীক বৈজ্ঞানিক অ্যারিস্টটল, আরব পণ্ডিত ইবন অল হাইতাম, যিনি আলহাজেন্ নামে বেশী পরিচিত ছিলেন (Ibn al Haitam : 965 1038), ইংরেজ বৈজ্ঞানিক রজার বেকন (Roger Bacon : 1214-94), হিব্রু পণ্ডিত লেভি বেন গেরশন (Levi Ben Gershon : 1288-1344) ইত্যাদি ব্যক্তিদের গবেষণার প্রভাব ছিল যথেষ্ট।

যাইহোক, এর থেকেই উৎসাহিত হয়ে দা ভিঞ্চির স্বদেশবাসী ডেলা-পোরতা (Giovanni Battista della Porta : 1540-1615) নামে এক বৈজ্ঞানিক 'ক্যামেরা অবস্কিউরা'র বিশেষ উন্নতি সাধন করলেন এবং ১৫৫৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম ক্যামেরা বাস্তবে রূপ নিল। এর আগে 'ক্যামেরা অবস্কিউরা' ছিল একটা অন্ধকার ঘর, যার এক দেওয়ালে কোন ক্ষুদ্র ছিদ্র দিয়ে প্রতিফলিত হ'ত বাইরের দৃশ্য অপর পাশের দেওয়ালে। সাধারণত সূর্যগ্রহণ দেখা হ'ত এর সাহায্যে। তবে ডেলাপোরতার যন্ত্রটা ছিল নিতান্তই সাধারণ গোছের। এতে চ্যাপ্টা একটা জায়গার ওপর দৃশ্যবস্তুর ছায়া পড়ত।

'ক্যামেরা অবস্কিউরা'তে প্রথম লেন্স ব্যবহার হয় ১৫৫০ খ্রীষ্টাব্দে। এই দ্বি-উত্তল লেন্সটি (Bi-Convex lens) ব্যবহার করেন গারদানো (Gardano) নামে এক বৈজ্ঞানিক।

ডেলাপোরতার এই ঘটনার পর অনেকে চিন্তা করতে লাগলেন এই ক্যামেরাকে আরও উন্নত করা যায় কিভাবে। ১৫৬৮ সালে ডেলা-পোরতারই স্বদেশবাসী বারবারো (Daniel Barbaro) অনেক গবেষণার পর দেখলেন, এই অবস্কিউরা ক্যামেরার বাক্সের ভেতরে প্রতিফলিত আলোকরশ্মিকে কম বেশী করার ব্যবস্থা করতে হবে, তা না হলে প্রতিচ্ছবি সমানভাবে স্পষ্ট হবে না। বারবারো প্রথম, সমগ্র অর্থে ডায়াফ্রামের (Diaphragm) প্রচলন করলেন।

১৫৭৩ সালে দান্তি (Danti) নামে এক বৈজ্ঞানিক পরামর্শ দিলেন অবতল আয়না (Concave mirror) ব্যবহারের, যার ফলে প্রতিফলিত বিষয়বস্তু সোজা করে দেখা গেল। অবস্কিউরা, নকল (tracing) করার কাজে খুব কাজে লাগতে থাকল। তার আকৃতিও সুবিধামত পরিবর্তিত হতে থাকল। বহনযোগ্য ক্যামেরাও তৈরী হোল।

ইটালী থেকে ক্যামেরা অবস্কিউরা জার্মানিতে এসে আরো উন্নত হ'ল জ্যোতির্বিজ্ঞানী কেপলারের (Johannes Kepler : 1571-1630) হাতে। বাস্তব পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর কেপলার দেখলেন, যদি ক্যামেরাতে প্রতিফলিত চিত্র আরও স্পষ্ট এবং উজ্জ্বল করতে হয়, তবে এর ভেতরের চারদিকে কালো রঙ করতে হবে এবং সমস্ত ফাঁক বন্ধ করে দিতে হবে, যাতে বিষয়বস্তু থেকে প্রতিফলিত রশ্মি ছাড়া অন্য আলো ক্যামেরার ভেতর প্রবেশ করতে না পারে। ১৬২০ সালের মাঝামাঝি সময়ে এই সংযোজনটি হ'ল।

এবার অবস্কিউরা ক্যামেরার মাধ্যমে দেখা ছবি আরও অনেক সুন্দর হয়ে গেল। ছবি দেখা, প্রতিফলিত দৃশ্য বা বিষয়বস্তু থেকে নকল করার কাজে শিল্পীদের কাছে এর সমাদর তো ছিলই, এখন থেকে অনেক সাধারণ ব্যক্তিও ক্যামেরা তৈরী করে ছবি দেখতে লাগলেন। পাশাপাশি একদল সৃজনশীল লোক ক্যামেরা আরও উন্নত করা যায় কি ভাবে এই নিয়ে চেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকলেন।

১৬৪৫ সালে, কারচার (Athanasius Kircher : 1601-1680) নামে এক জার্মান গণিতজ্ঞ ক্যামেরা অবস্কিউরার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে, এটাকে আরও উন্নত চেহারা দিলেন ১৬৪৬ সালে। ব্যাপারটা আরও গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে যে, কারচার এই সময়েই তাঁর 'Ars magna lucis et

umbrae' গ্রন্থে বর্ণনা দিলেন ম্যাজিক লণ্ঠনের। ম্যাজিক লণ্ঠনের গঠন এবং কার্যকারিতার বিস্তৃত বর্ণনা মানুষকে কৌতূহলী করে তুলল। ম্যাজিক লণ্ঠনের মাধ্যমে আপাত চিত্তবিনোদনের মধ্যেই লুকিয়ে ছিল আগামী দিনের চলচ্চিত্রের সম্ভাবনা। কাঁচের ওপর ভুষোকালি দিয়ে হাতে ছবি এঁকে ম্যাজিক লণ্ঠনের মাধ্যমে খৃষ্টের জীবনকাহিনী দেখালেন কারচার।

ম্যাজিক লণ্ঠন দ্রুত জনপ্রিয়তা অর্জন করল সারা ইউরোপ জুড়ে। কারচারের ম্যাজিক লণ্ঠনের অনুকরণ হতে থাকল। উন্নত ধরনের ম্যাজিক লণ্ঠন তৈরীর ব্যাপারে হল্যাণ্ড যথেষ্ট মুন্সীয়ানার পরিচয় দিল। এর মাধ্যমে অর্থ উপার্জনও শুরু হয়ে গেল।

দেখতে দেখতে পেরিয়ে গেল বেশ কয়েকটা বছর। ক্রমশ প্রদীপ থেকে মোমবাতি, তারপর গ্যাসের আলোতে ম্যাজিক লণ্ঠন দেখার প্রসার ঘটল। ম্যাজিক লণ্ঠনের যান্ত্রিক উন্নতিও ঘটতে থাকল। ধর্মীয় ও নীতি কাহিনীর ছবি দেখানোর সাথে সাথে মানুষের মনে ছবি দেখার আগ্রহও ক্রমশ বেড়ে যেতে থাকল। এই সুযোগে একদল ভণ্ড ধর্মযাজক শ্রেণীর লোক, ম্যাজিক লণ্ঠনকে মাধ্যম করে, সাধারণ মানুষের অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যতের কল্পিত বিকৃত ব্যাখ্যা করে, তার চিত্ররূপ দেখাতে শুরু করলেন। সাধারণত ধর্মীয় স্থানে অথবা শিষ্যদের বাড়ীতে এই সব ছবি দেখান হ'ত। ছবি দেখানোর আগে ধোঁয়া দিয়ে আধিভৌতিক পরিবেশের সৃষ্টি করা হ'ত যাতে দর্শকরা সহজেই মোহগ্রস্থ হয়ে পড়ে।

কিন্তু একটা কথা অস্বীকার করা যায় না যে এই সমস্ত লোকেরা যেমন একদিকে লোক ঠকানোর ব্যবসা করছিলেন, অপরদিকে তেমনই নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে ম্যাজিক লণ্ঠনের আকৃতির এবং কার্য্যকরী ক্ষমতারও উন্নতি সাধন করছিলেন।

ম্যাজিক লণ্ঠন নিয়ে ফ্রান্স, ইটালী, হল্যাণ্ড, জার্মানী এক কথায় সারা ইউরোপ জুড়ে যখন ব্যবসা চলছিল, কিছুলোক তখন চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন কিভাবে ছবি স্থায়ী করা যায়, চলমান ছবি দেখান সম্ভব কিনা ইত্যাদি নিয়ে। এমনই একজন লোক শুলজ্। জার্মান প্রকৃতি বিজ্ঞানী এবং রসায়নবিদ্ শুলজ্ (Johann Heinrich Schulze : 1687-1744) দেখলেন সিলভার নাইট্রেট (Silver Nitrate) এবং চকের (Chalk)

অ্যারিস্টটল
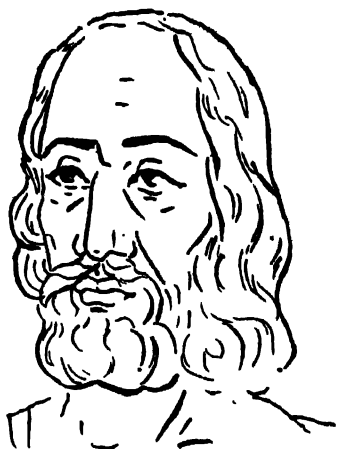
আর্কিমিডিস

ইউক্লিড

আল হাজেন

লিওনার্দো দা ভিঞ্চি

রজার বেকন
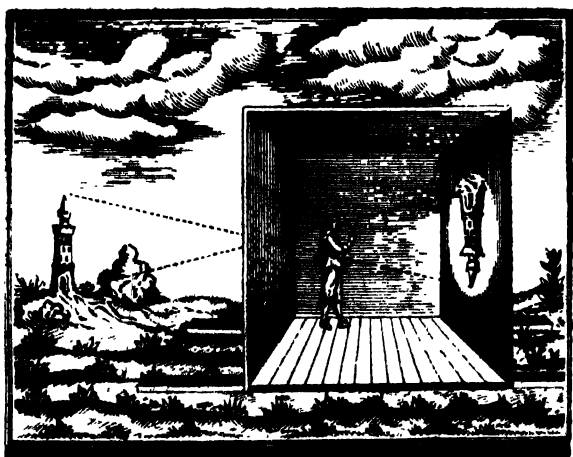
ক্যামেরা অবস্‌কিউরা

মিশ্রণ আলোর সংস্পর্শে কালো হয়ে যায়। এই পদ্ধতিকে কাজে লাগিয়ে তিনি Stencil থেকে Contact copy তৈরী করেন। সময়টা ছিল ১৭২৫ সাল। যদিও এই ছবিগুলো স্থায়ী ছিল না, তবু শুলজের প্রচেষ্টা, প্রতিচ্ছবিকে স্থায়ী করে রাখার ব্যাপারে রসায়নকে কাজে লাগাবার একটা পথ দেখাল।

১৭৭৭ সালে, সুইডিস রসায়নবিদ্ এবং ঔষধ প্রস্তুতকারক শীলে (Carl Wilhelm Scheele : 1742-1786) দেখলেন সিলভার ক্লোরাইড (Silver chloride) আলোর মাত্রার তারতম্যে কমবেশী কালো হয় এবং এই কালো অংশটা কমে যাওয়া সিলভার। তিনি আরও লক্ষ্য করলেন সিলভার ক্লোরাইড খুব তাড়াতাড়ি কালো হয় বেগুনী বর্ণচ্ছটায়। তিনি এই বর্ণচ্ছটার নাম দিলেন অতি বেগুনীচ্ছটা (Ultra Violet Ray)। এর কিছুদিন পরেই অর্থাৎ ১৭৮৯ সালে শুরু হোল ফরাসী বিপ্লব। এর প্রভাব দেশের গণ্ডী পার হয়ে সমগ্র ইউরোপ জুড়ে বিস্তার লাভ করল। সামাজিক সংস্কার এবং পুরোন ধারণা পাল্টাবার সময় এল।

বাস্তবিক, অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকেই বুদ্ধিশালী ব্যক্তিরা পরস্পর সম্পর্কে বিশেষ ওয়াকিবহাল হন, যার ফলে আমরা ঊনবিংশ শতাব্দীতে শুধুমাত্র ছবির (Photography) ক্ষেত্রেই নয়, প্রযুক্তি বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় বিশেষ উন্নতি দেখতে পাই।

১৮০০ সালে ইংল্যাণ্ডবাসী জার্মান বৈজ্ঞানিক হারশেল (Friedrich Willhelm Herschel : 1738-1822 , সূর্যালোকের বর্ণচ্ছটা নিয়ে গবেষণাকালে, অবলোহিত (Infra Red) রশ্মি আবিষ্কার করেন। এই রশ্মিদ্বারা নিয়ন্ত্রিত প্রতিচ্ছবি পরবর্তী কালে শুধুমাত্র জ্যোতির্বেত্তা, প্রকৃতি বিজ্ঞানী এবং পদার্থ বিদ্যাবিদদেরই নয়, বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় এত প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে যে, হয়ত এর অভাবে অনেক আবিষ্কারই পিছিয়ে যেত অনেকদিন।

এই বছরেই ইংল্যাণ্ডে ওয়েজউড (Thomas Wedgwood : 1711-1805), তাঁর বন্ধু ডেভির (Sir Humphry Davy 1778-1829) সাথে প্রতিচ্ছবি গ্রহণের ব্যাপারে একধাপ এগিয়ে গেলেন। তাঁরা কাগজ বা চামড়া অথবা কাঁচের খণ্ড সিলভার নাইট্রেট অথবা সিলভার ক্লোরাইডে ভিজিয়ে নিয়ে, গাছের পাতা এবং মানুষের ছায়ার (Silhoutte) প্রতিচ্ছবি গ্রহণে সক্ষম হলেন। তাঁদের এই কাজ ১৮০২ সালে 'An account of a method of copying paintings upon glass and making profiles by the agency of light upon nitrate of silver' নামক গ্রন্থে প্রকাশ করলেন। কিন্তু এক্ষেত্রেও শুলজের মতো সেই একই অসুবিধা দেখা দিল। প্রতিচ্ছবি স্থায়ী এবারেও করা গেল না। তবে তাঁরা হাল ছাড়লেন না। এই নিয়ে আবার গবেষণায় নিরত হলেন ; আর এই স্যার ডেভিই ১৮১৩ সালে বৈদ্যুতিক আর্ক ল্যাম্প আবিষ্কার করে প্রতিচ্ছবি প্রক্ষেপণের (Projection) ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছিলেন। ১৮০৭ সালে তৈরী হলো ক্যামেরা লুসিডা (Camera Lucida)। ইংল্যাণ্ডেই

জোহান হাইনরিখ শুলজ
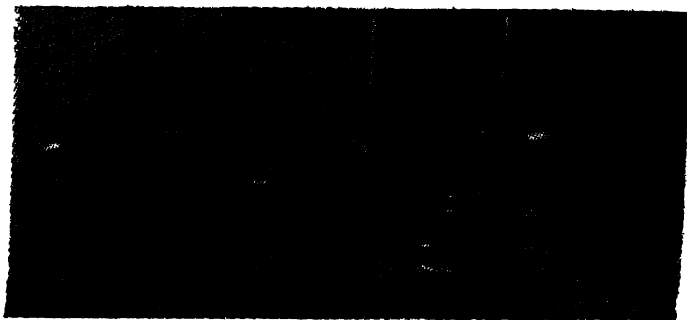
ম্যাজিক লণ্ঠন

টমাস ওয়েজউড
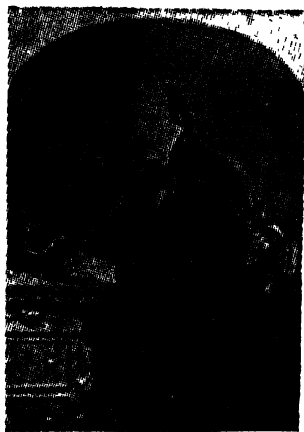
উইলিয়াম হেনরি ফক্স ট্যালবট্
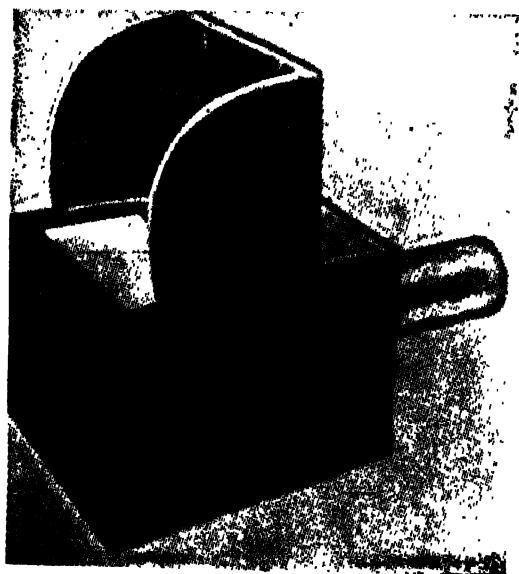
ক্যামেরা লুসিডা

আবার ঘটল এই ঘটনা। ওলাসটন (Dr. William Hyde Wollaston : 1766-1828) নামে এক বৈজ্ঞানিক, ১৬৬৮ সালে হুকের (Dr. Robert Hooke) তৈরী পুরোন ক্যামেরার দ্বিউত্তল লেন্স পাল্টে, একদিকে অবতল (Concave) অপরদিকে উত্তল (Convex) লেন্সের ব্যবহার করলেন। এই লেন্সের নাম হ'ল মিনিসকাস লেন্স (Meniscus lens)। এই লেন্স পঞ্চাশ ডিগ্রীর মতো বিস্তৃত পটভূমির উপরের রশ্মি কেন্দ্রের (focus) দৈর্ঘ্য সম্পর্কে ঠিক অনুপাত দিতে সক্ষম হোল। এর ফলে প্রতিফলিত চিত্র অনেক স্পষ্ট আর উজ্জ্বল হ'ল।) নক্সা অঙ্কনকারীরা (Draughtsman) সাদরে এটাকে গ্রহণ করলেন। এই ক্যামেরা লুসিডাই কিছুদিন পরে ট্যালবট (William Henry Fox Talbot : 1800-77) নামে এক ইংরেজ প্রত্নতাত্ত্বিক, রাসায়ণবিদ, ভাষাবিদ, গণিতবেত্তার মনে বিশেষ আলোড়ন এনেছিল। ট্যালবট, লুসিডা ক্যামেরা দিয়ে কোমো (Comoe) লেকের ছবি আঁকছিলেন আর—

" ···The idea occured to me... how charming it would be, if it were possible to cause these natural images to imprint themselves durably, and remain fixed upon the paper !"

এর ফলশ্রুতি কি হোল আমরা পরে দেখতে পাব। এদিকে ফ্রান্সে নিয়েপস্ (Joseph Nicephore Niepce : 1765-1833) নামে এক মুদ্রণ বিশেষজ্ঞ (Lithographist) ক্যামেরা, ছবিতোলা ইত্যাদি ব্যাপারে বিশেষ আগ্রহী হয়ে উঠলেন।

১৮১৬ সালের মে মাসের কোন একদিন ক্যামেরা অবস্কিউরা দিয়ে কতকগুলো বাড়ীর ছবিও তুলে ফেললেন। ছবি সংরক্ষণের জন্য সিলভার ক্লোরাইডে ভেজান কাগজ, কাঁচ, দস্তা, তামার পাত অনেক কিছু ব্যবহার করলেন, কিন্তু এবারেও ছবি স্থায়ী হ'ল না। ১৮২২ সালে কাঁচের ওপর জুডিয়া বিটুমেনের (Bitumen of Judea) প্রলেপ লাগিয়ে যে ছবি তুললেন তা কিছুটা ধরে রাখা গেল। এরপর কাঁচের খণ্ডে বা বিভিন্ন ধাতুর পাতের ওপর অ্যাসফল্টের বার্ণিশ (Asphalt Varnish) লাগিয়ে ছবি নেওয়ার চেষ্টা করলেন। ছবি সংরক্ষণের জন্য কতকগুলো তেলের সংমিশ্রণ ব্যবহার করলেন, কিন্তু এতেও প্রতিফলিত ছবির বর্ণের সমন্বয় বা আনুপাতিক গুরুত্ব বজায়

রাখা গেল না। তাঁর পদ্ধতিতে ছবি তোলার ব্যাপারটাও সহজ সাধ্য ছিল না।

সময়ে সময়ে পুরো একটা দিন লেগে যেত একখানা ছবি নিতে। দিনের বিভিন্ন সময়ে সূর্যের স্থান পরিবর্তনের ফলে বিষয়বস্তুও সমানভাবে আলো পেত না। ১৮২৬ সালে নিয়েপস্ টিন, সীসা ইত্যাদির এক মিশ্রিত ধাতুর (Pewter) পাত বিটুমেনে ভিজিয়ে নিয়ে তার উপর প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবি নিতে সক্ষম হলেন। এই ছবি নেওয়ার জন্য তাঁকে প্রায় আট ঘণ্টা রৌদ্রে থাকতে হয়েছিল। তবে, একথা ভুলে গেলে চলবে না, নিয়েপসের প্রাথমিক লক্ষ্য ছিল ক্যামেরায় তোলা ছবি, ছাপার উপযুক্ত ব্যবস্থা করা। বাকি কাজটা বোধ হয় দ্যাগিউরের জন্য অপেক্ষা করছিল।

দ্যাগিউর (Louis Jacques Mande Daguerre : 1787-1851) মুখ্যতঃ চিত্রশিল্পী ছিলেন। প্যারিসে আলোছায়ার প্রদর্শনী (Diorama) করার সময়ে তিনি ক্যামেরার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। ক্যামেরা অবস্কিউরাকে আরও উন্নত করে ফেলেছিলেন তাঁর বন্ধু শ্যেভালিয়ের (Charles Chevalier) সাহায্যে। ছবি আঁকার কাজে অবস্কিউরা ব্যবহার করার সময়ে, সরাসরি ছবি স্থায়ী করার ব্যাপারটা তাঁর মাথায় আসে। নিয়েপসের কাজকর্মের খবর শুনে তিনি নিয়েপস্‌কে তাড়াতাড়ি চিঠি লিখলেন। সময়টা ছিল ১৮২৬ সালের জানুয়ারী মাস। নিয়েপস্ কিন্তু দ্যাগিউরের সাথে যোগাযোগের কোন উৎসাহ দেখালেন না। দুজনের দেখা হতে লেগে গেল প্রায় একটা বছর। ১৮২৭ সালের অগাষ্ট মাসের আগে দেখা হোল না।

এদিকে নিয়েপস্ তাঁর কাজের পদ্ধতি বলতে না চাওয়ায়, লণ্ডনের রয়েল সোসাইটি নিয়েপসের আবিষ্কারকে স্বীকৃতি দিল না। নিয়েপসের তখন ষাটের ওপর বয়স হয়ে গেছে, ১৮২৮ সালে রয়েল সোসাইটির এই প্রত্যাখ্যান স্বাভাবিকভাবেই তাঁকে নিরুৎসাহ করে দিল।

যাই হোক ১৮২৯ সালে নিয়েপস্ এবং দ্যাগিউর, দশ বছরের এক চুক্তিতে আবদ্ধ হলেন। চুক্তি রইল গবেষণার সমস্ত কাজ গোপন থাকবে। ফলাফল দুজনের নামে প্রকাশিত হবে। আর লাভ সমানভাবে ভাগ হবে। নিয়েপস্ তাঁর কাজ দ্যাগিউরকে হাতেনাতে দেখিয়ে দিলেন কিন্তু দুই

অংশীদারে আর দেখা হল না। ১৮৩৩ সালে নিয়েপস্ হঠাৎ মারা গেলেন।

দ্যাগিউরের কাজ কিভাবে এগুচ্ছিল সে সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না, কারণ দ্যাগিউর তাঁর ল্যাবরেটরিতে কাউকেই ঢুকতে দিতেন না। নানারকম গল্প শোনা যায় তাঁর কাজের ব্যাপারে। যাই হোক ১৮৩৯ সালের ৭ই জানুয়ারী ছিল ফটোগ্রাফীর ইতিহাসে এক স্মরণীয় দিন। দ্যাগিউর-এর এক পদার্থ বিজ্ঞানী, জ্যোতির্বেত্তা এবং রাজনীতিবিদ্ বন্ধু আরাগো (Fancois Arago) এইদিন French Academy of Science-এর সামনে দ্যাগিউর এর আবিষ্কার প্রকাশ করলেন। DAGUERREO-TYPE যেভাবে সেখানে পেশ করা হয়েছিল তা হোল ঃ—

DAGUERREOTYPE—Photograph taken by the method published by L. J. M. Daguerre in France in 1839. It consists of a positive image formed by mercury vapour on a polished coating of silver on a copper plate.

There are five steps in the daguerreotype process.

1) Preparing : A sheet of copper carrying a coating of metallic silver (produced by electroplating or by the sheffield plate process) is buffed to a very high polish.

2) Sensitizing : The plate is exposed to iodine vapour in a light-tight 'iodizing box' until it is uniformly covered with an orange coating of Silver iodine. This coating is light sensitive.

3) Exposing : The plate is exposed in a Camera for anything upto twenty minutes in bright daylight. The Camera Lens was sometimes equipped with a reversing mirror since the image produced in a reverse (right to left) positive.

4) Developing : The image is developed by exposing the plate to the vapour of mercury heated to 140°F (60°C). The mercury amalgamates with the silver and clings to the h ghlights.

5) Fixing : The unused silver iodide is washed off with a weak solution of Sodium Hyposulphite. After washing, the image is now permanent ; the highlights consist of a milky deposit of mercury amalgam and the shadows of plain polished silver.

ফটোগ্রাফীর ইতিহাসে একটা বলার মত ঘটনা ঘটলো।

১৮৩৯ সালের ১৯শে অগাষ্ট, ফরাসী সরকারের তরফ থেকে সমস্ত পৃথিবীবাসীকে এই পদ্ধতি বা আবিষ্কার উপহার হিসেবে দেবার কথা ঘোষণা করা হোল। কিন্তু হায়! ১৪ই অগাষ্ট, দ্যাগিউর ইংল্যাণ্ড থেকে পেটেন্ট (Patent) নিয়ে বসে আছেন।

(প্রতিচ্ছবি স্থায়ী করে রাখার ব্যাপারে যখন বিস্ময়কর উন্নতি হচ্ছিল, ছবিতে গতিসঞ্চার করার প্রচেষ্টায় কিন্তু ভাঁটা পড়েনি।) রোজেট (Peter Mark Roget) নামে এক চিকিৎসক লণ্ডনে বসে তখন মানুষের অনুভূতি এবং বোধের ব্যাপারে গবেষণা করছিলেন। রয়েল কলেজে (Royal College of Physicians) তিনি আলোচনা করেন 'The Laws of Sense and preception' নিয়ে। ঘটনাচক্রে তিনি 'অবিরাম দৃষ্টিতত্ত্ব' সম্পর্কেও কৌতূহলী হন। ১৮২৪ সালে তিন বছরের গবেষণার ফল তিনি প্রকাশ করলেন রয়েল সোসাইটির কাছে তাঁর 'Persistence of vision with regard to Moving objects' প্রবন্ধে। সারা ইউরোপ জুড়ে এর প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। যে আশা মানুষের মনে অনেকদিন আগে থেকেই বিরাজমান ছিল, রোজেট তার বাস্তব চেহারা দেবার রাস্তাটা দেখিয়ে দিলেন।

১৮২৬ সালে প্যারিস (John Ayrton Paris) নামে আরেক চিকিৎসক তৈরী করলেন থাউমেট্রোপ (Thaumatrope)। এটা ছিল একটা শক্ত কাগজের চাক্তির দু'পাশে আঁকা দুটো আলাদা ছবি। এক পাশে একটা খাঁচা অপরদিকে একটা পাখী। কাগজটার দুপাশে সুতো দিয়ে বাঁধা থাকত। অক্ষরেখার (Axis) ওপর কাগজটা ঘুরতে শুরু করলেই অবিরাম দৃষ্টিতত্ত্বের নিয়মানুসারে, একটা ছবিই দেখা যেত। মনে হোত খাঁচার ভেতরে পাখীটা বসে আছে। ইউরোপের বাজার ছেয়ে গেল এই জাতীয় খেলনায়।

প্যারিসের এই সাফল্যের অনুরণন জাগলো বেলজিয়ামের এক বৈজ্ঞানিকের মনে। তাঁর নাম হোল প্লাটো (Joseph Antoine Ferdinand Plateau : 1801-83)। প্লাটো যখন ঘেন্ট (Ghent) বিশ্ববিদ্যালয়ে এই ব্যপারে কাজ করছিলেন, তখন স্ট্যাম্ফার (Dr. Simon Von Stampher) নামে আবেক বৈজ্ঞানিকও ব্যস্ত ছিলেন একই বিষয়বস্তু নিয়ে অস্ট্রিয়ায়।

প্লাটো আর স্ট্যাম্ফার দুজনে প্রায় একই সময় তৈরী করলেন পৃথিবীর প্রথম গতিশীল ছবি দেখার যন্ত্র। যদিও দুজন বৈজ্ঞানিক পরস্পরের কাজ সম্পর্কে কিছুই জানতেন না, দুজনের যন্ত্র কিন্তু বিস্ময়কর ভাবে প্রায় একই রকম হোল, আকৃতি এবং কার্য্যপ্রণালীর দিক থেকে। এই যন্ত্রে ছিল বৃত্তাকার কাঁচের ওপর কালি দিয়ে আঁকা ছবি। ছবি স্পষ্ট এবং উজ্জ্বল করার জন্য থাকতো পেছন থেকে জোরাল আলোর ব্যবস্থা। ছবি দেখার ব্যবস্থা ছিল একটা গর্ত করা চাকতির (Disc) আড়াল থেকে। দুটো চাকতিই নিজ নিজ অক্ষরেখার ওপর যাতে ঘুরতে পারে এরকম ব্যবস্থা ছিল। একটা নির্দিষ্ট গতিতে এলেই স্থির ছবি প্রাণবন্ত হয়ে উঠত। ১৮৩২ সালে বেলজিয়াম আর অস্ট্রিয়ায় তৈরী হ'ল এই যন্ত্র।

প্লাটো তাঁর যন্ত্রের নাম দিলেন ফেনাকিস্টোস্কোপ (Phenakistoscope), আর স্ট্যাম্ফার নাম দিলেন স্ট্রোবোস্কোপিক ডিস্ক (Stroboscopic Disc)।

পৃথিবীর অগণ্য মানুষেব চোখের সামনে আলো-ছায়ার সাম্রাজ্য খুলে দেওয়ার জন্য যার সবচেয়ে বেশী দেখার দরকার ছিল, তাঁরই চোখের সামনে ঘনিয়ে এল অন্ধকার। ১৮২৯ সালে, প্লাটো একদিন দুপুরবেলা তাঁর লেবরেটরির বাইরে এলেন। পৃথিবীর সমস্ত আলোর উৎস, সূর্যের দিকে তাকিয়ে রইলেন প্রায় কুড়ি সেকেণ্ড। অপলক ছিল তাঁর দৃষ্টি। আলো-দৃশ্য এবং তার স্থায়িত্ব বোঝার অবকাশ কিন্তু এই সূর্য তাঁকে দিল না। লেবরেটরিতে ফিরে এসে দেখলেন গভীর অন্ধকার নামছে তাঁর দুই চোখে। কয়েকদিন পরে অবশ্য আবার তাঁর দৃষ্টিশক্তি ফিরে এল, কিন্তু চোদ্দ বছর তাঁকে সইতে হোল চোখের যন্ত্রণা; আর ১৮৪৩ সালে পৃথিবীর সমস্ত আলো তাঁর চোখের সামনে থেকে মুছে গেল।

ইতিমধ্যে প্লাটো, তাঁর যন্ত্রের নাম পাল্টে নতুন নাম রেখেছিলেন ফ্যান্টোস্কোপ (Fantoscope)। ফ্যান্টোস্কোপে, শয়তানের ক্রিয়া-কলাপ নিয়ে দেখান হলো নতুন ছবি 'Le Diable Soufflant'।

স্ট্যাম্ফারের শহর ভিয়েনায় বাস করতেন উখাটিয়াস (Baron Franz Von Uchatius : 1811-1881)। তিনি অস্ট্রিয়ান গোলন্দাজ বাহিনীর দ্বিতীয় রেজিমেন্টের এক লেফটেন্যান্ট। বিজ্ঞানের প্রতি স্বাভাবিক কৌতূহলে, ১৮৫৩ সালের কোন একদিন, কারচারের ম্যাজিক

জোসেফ নিসেফোর নিয়েপস

লুই জ্যাক মঁদ দ্যাগিউর

থাউমেট্রোপ

জোসেফ আন্তোয়ান ফার্দিনান্দ প্লাটো
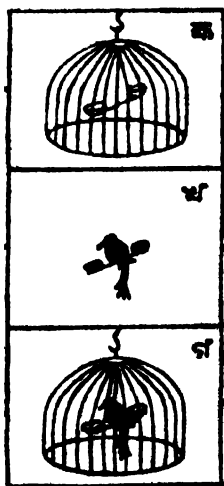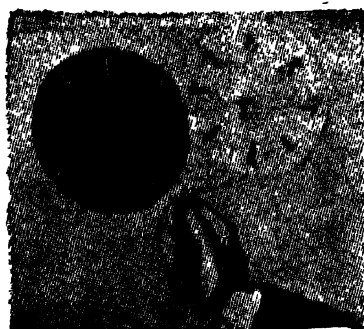
ফেনাকিস্টোস্কোপ

স্ট্রোবোস্কোপিক ডিস্ক

লণ্ঠন এবং স্ট্যাম্ফারের স্ট্রোস্কোপিক ডিস্কের মধ্যে সমন্বয় ঘটিয়ে প্রতিচ্ছবি দেওয়ালে প্রতিফলনের একটা ব্যবস্থা করলেন। এতদিন স্ট্রো-স্কোপ বা ফ্যান্টোস্কোপে একবারে মাত্র একজনই ছবি দেখতে পেত, এবার থেকে তা একসাথে অনেক লোকের মনোরঞ্জন করতে সমর্থ হোল।

ইংল্যাণ্ডের ব্রিস্টল শহরে এক মন্ত্রীপুত্র হর্ণার (William George Horner : 1786-1837), ফ্যান্টোস্কোপের ছবিগুলোকে আরও নিপুণভাবে উপস্থাপনা করলেন। যে যন্ত্রের মাধ্যমে তিনি এই প্রয়োগনৈপুণ্য দেখালেন, Philosopical magazine থেকে তার নাম জানতে পারা যায় ডিডেলিয়াম (DÆDALEUM)।

১৮৬০ সালে দেভিনের (Desvignes) তৈরী উন্নতমানের ডিডেলিয়া-মের নাম হোল জোয়েট্রোপ (Zoetrope) বা জুট্রোপ (Zootrope)। এর আরেকটা নামও প্রচলিত ছিল, তা হোল 'Wheel of Life'।

এদিকে ১৮৩৯ সালে, হারশেল (Sir John Frederick William Herschell : 1792-1871) নামে এক ইংরেজ বৈজ্ঞানিক, ছবি তোলার পদ্ধতিকে ফটোগ্রাফী (Photography) এবং পজেটিভ্ (Positive), নেগেটিভ্ (Negative) ইত্যাদি শব্দগুলোর প্রচলন করলেন।

হারশেলই, প্রথম সোডিয়াম থায়সালফেট (Sodium thiosulphate) ব্যবহার করলেন প্রতিচ্ছবি স্থায়ী করার কাজে।

১৮৩৯ সালে, ওলকট (Alexander Wolcott : 1804-44) নামে একজন অ্যামেরিকান যন্ত্রবিদ্, অবতল আয়নাযুক্ত এক ক্যামেরা তৈরী করেন এবং সমকালীন অবস্থায় সবচেয়ে সুন্দরভাবে মানুষের প্রতিকৃতি গ্রহণে সক্ষম হন।

ওলকট্ ১৮৪০ সালের মার্চ মাসে পৃথিবীর প্রথম প্রতিকৃতি গ্রহণের স্টুডিও খোলেন।

১৮৪০ সালে তৈরী হ'ল পেতভ্যাল লেন্স (Petzval lens)। হাঙ্গেরীর বৈজ্ঞানিক পেতভ্যাল (Joseph Max Petzval : 1807-1891), সমকালীন প্রথানুগ লেন্সের বিধি লঙ্ঘন ক'রে ৩'৬ ফোকাসের এই লেন্সটি তৈরী করলেন। ওলাসটনের মিনিসকাস লেন্সের পর, পেতভ্যাল লেন্স ফটোগ্রাফীর কার্য্যকরী ক্ষেত্রে বিশেষ উন্নতি ঘটাল। লেন্সের উন্নতির সাথে সাথে ক্যামেরারও আকৃতি এবং কার্য্যকরী অবস্থার উন্নতি ঘটতে থাকল।

এদিকে ট্যালবট্, যাকে আমরা শেষ দেখতে পেয়েছিলাম কোমো লেকের ধারে, রয়েল সোসাইটির কাছে প্রকাশ করলেন তাঁর গবেষণার ফলাফল—'Some Account of the Art of Photographic Drawings, or the process by which Natural Objects may be made to delineate themselves without the Aid of the Artists pencil'। এই পদ্ধতিকে ট্যালবট্ বললেন ক্যালোটাইপ (Calotype)।

এই পদ্ধতিতে বলা হোল—"The basic process employed iodized paper— i. e., best quality letter paper brushed over with a solution of silver iodide and Potassium iodide and allowed to dry.

Before use, the paper was treated with a solution consisting of silver nitrate, acetic acid and gallic acid crystals.

The paper could be then be exposed in the camera either wet or after drying, exposure being around five minutes at f8 in bright sunlight.

After exposure, development was carried out in a silver nitrate and gallic acid solution similar to that used for preparing the iodized paper for exposure. It was then rinsed, fixed in 'hypo', washed and dried. The printing time of the resulting paper negative could be shortened by waxing the back of the paper to make it more translucent." ১৮৪১ সালে ট্যালবট্ পেটেন্ট নিলেন এই পদ্ধতির।

অ্যামেরিকায় সেলারস্ (Coleman Sellers) নামে এক যন্ত্রবিদ্ তৈরী করলেন কিনেমাটোস্কোপ (Kinematoscope)। গতির ক্রমান্বয় পর্য্যায়ের একের পর এক ছবি তুললেন সেলারস্। অভিনেতা হলেন সেলারসের ছেলে। অর্থাৎ ব্যাপারটা হ'ল wheel of life এর ছবিগুলো যেমন হাতে আঁকা ছিল, এক্ষেত্রে সেগুলো হ'ল ফটোগ্রাফির মাধ্যমে।

সাধারণ একটা দুই লেন্স (twin lens) ক্যামেরা দিয়ে ছবিগুলোকে ঘনদৃক (Stereoscopic) করে দেখার ব্যবস্থা করা হ'য়েছিল। ৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৬১ সালে সেলারস্ কিনেমাটোস্কোপের পেটেন্ট নিলেন। 'কিনেমা' এই গ্রীক শব্দ, যার অর্থ গতি, তারও সূত্রপাত হ'ল এই ভাবে এবং ক্রমশঃ চলচ্চিত্রের প্রতিশব্দ হিসেবে এর পরিচিতি ছড়িয়ে পড়ল। এর পর এল ফ্যাস্মাট্রোপ (Phasmatrope)। কিনেমাটোস্কোপের আরও একটু উন্নত অবস্থার এই যন্ত্র, সেলারসের শহর ফিলাডেলফিয়াতেই আবিষ্কার করলেন হেইল (Henry Renno Heyl)।

১৮৭০ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারী প্রদর্শনী হয়েছিল এই যন্ত্রের। ম্যাজিক লণ্ঠনের আলোতে, পাতলা কাঁচের ওপর তোলা ছবি চক্রাকার আবর্তনে এই ছবি প্রক্ষেপণের ব্যবস্থা হয়েছিল। হেইলই প্রথম ফটোগ্রাফ প্রক্ষেপণ করলেন। সেলারসের যন্ত্র ছিল ক্যামেরায় তোলা ছবি জোয়েট্রোপ ধরণের যন্ত্রে দেখার ব্যবস্থা।

ট্যালবটের কাজের পর আসে আরচারের (Frederick Scott Archer : 1813-57) কলোডিয়ন পদ্ধতি (Collodion process)। এই কলোডিয়ন বা ওয়েট প্লেট প্রসেস (wet plate process) ১৮৫১ সালে ইংল্যাণ্ডে প্রকাশিত হয়। স্বচ্ছ কাঁচের ওপর লাগান হোত কলোডিয়ন, যার মধ্যে পটাসিয়াম ছাড়াও আরও অন্যান্য আয়োডাইড (Iodide) থাকত। এই অবস্থায় একটা অন্ধকার জায়গায় এটাকে ডুবিয়ে রাখা হোত সিলভার নাইট্রেটের দ্রবণে, যতক্ষণ না আলোক সংবেদনশীল হয়ে ওঠে। ভেজা অবস্থাতেই ক্যামেরায় পুরে ছবি তোলা হোত। ছবি তোলার পর, ফেরাস সালফেট (Ferrous Sulphate) এবং এ্যাসেটিক অ্যাসিড দিয়ে ছবি পরিস্ফুটনের কাজ করা হোত। প্রতিচ্ছবি স্থায়ী করার জন্য ব্যবহার করা হোত পটাসিয়াম অথবা সোডিয়াম সায়ানাইড (Sodium Cyanide)।

আরচারের কলোডিয়ন পদ্ধতি, দ্যাগিউর বা ট্যালবটের পদ্ধতির চেয়ে অনেক বেশী জনপ্রিয় হয়। ১৮৫১ সালের মার্চ মাসে আরচার তাঁর পদ্ধতি জগৎবাসীকে উপহার দেন। যদিও ট্যালবট দাবী করেছিলেন আরচারের পদ্ধতি তাঁর কাজের পদ্ধতির শর্ত লঙ্ঘন করেছে এবং আরচারের নিজস্ব কোন কৃতিত্ব নেই, কিন্তু আইন এই দাবী মেনে নেয় নি। ১৮৫৪ সালের ডিসেম্বর মাসে এই ব্যাপারে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয়ে যায়।

ট্যালবটের ক্যালোটাইপ বা আরচারের কলোডিয়ন পদ্ধতি, প্রতিচ্ছবি গ্রহণের ব্যাপারে অনেক কার্য্যকরী এবং সহজসাধ্য হলেও, কাঁচের ওপর ছবি তুলে গতিশীল করার প্রচেষ্টা বাস্তবিকই সময় এবং খরচ সাপেক্ষ ব্যাপার ছিল। তাই, কাঁচের মত স্বচ্ছ অথচ হাল্কা, শক্ত এবং নমনীয় কোন জিনিষের প্রয়োজন অবশ্যম্ভাবী ছিল। বোধ হয় সেই কারণেই চিন্তাশীল মানুষদের পরবর্তী কাজের লক্ষ্য ছিল আজকের সেলুলয়েড (Celluloid) নামে পরিচিত বস্তুটির আবিষ্কারের দিকে।

উন্নত ম্যাজিক লণ্ঠন

কিনেমাটোস্কোপ
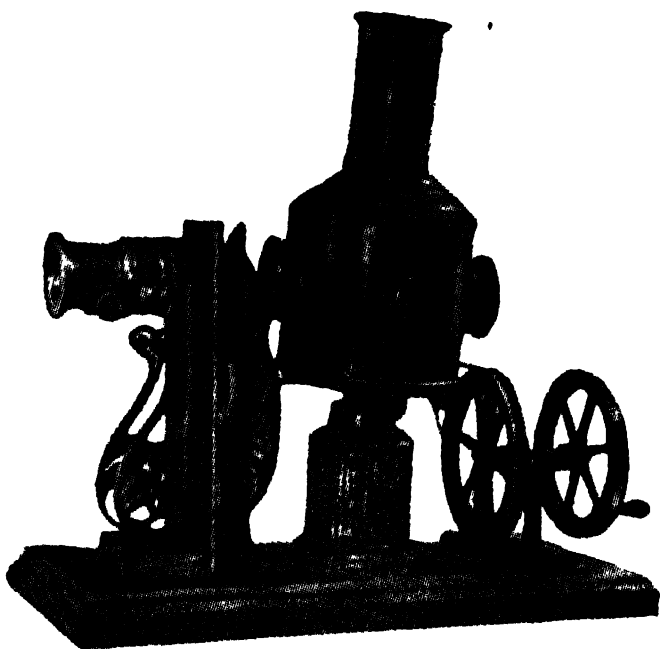
ফ্রেদেরিক স্কট আবচার

জার্মানিতে আজ থেকে প্রায় ১৩৫ বছর আগে, অর্থাৎ ১৮৪৫ সালে শ্যনবিয়েন (Christian Schonbein) নামে এক বৈজ্ঞানিক নাইট্রো সেলুলোজ (Nitro Cellulose) আবিষ্কার করেন। এর থেকে প্লাস্টিক (Plastic) জাতীয় জিনিস তৈরীর সম্ভাবনা দেখা দেয়।

ছবির দুনিয়ার লোকেরা এই সম্ভাবনাকে কাজে লাগাবার চেষ্টা করতে থাকলেন। ১৮৫৬ সালে পারকেস (Alexander Parkes) নামে এক ইংরেজ বৈজ্ঞানিক, নাইট্রো সেলুলোজ, ক্যাম্ফর (Camphor) এবং অ্যালকোহলের (Alcohol) এক বিশেষ মিশ্রণ তৈরী করেন যার নাম হয় পারকেসাইট (Parkesite)। পারকেসের সহকর্মী, স্পিল (Daniel Spill) আরও উন্নত পর্যায়ে নিয়ে যান পারকেসের গবেষণাকে এবং পারকেসাইটের এক উন্নততর জিনিস আবিষ্কার করেন। তিনি এটার নাম দেন জাইলোনাইট (Xylonite)। এই জাইলোনাইটেরই এক বিশেষ এবং উন্নত অবস্থা হ'ল সেলুলয়েড। নিউইয়র্কের আলবেনিতে ১৮৬৯ সালে বহু আকাঙ্খিত বস্তুটির জন্ম হয়। হাইয়াত (John. W. Hyatt) নামে এক বৈজ্ঞানিক আরচারের কলোডিয়ন এবং পারকেস-স্পিলের পদ্ধতির সমন্বয়ে সৃষ্টি করেন আজকের সেলুলয়েডের প্রাথমিক অবস্থা। ১৫ই জুন, ১৮৬৯ সালের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পেটেন্ট গেজেট থেকে এর নাম পাওয়া যায় 'পাইরোজাইলিন' (Pyroxylin)। ১৮৭২ সালের ২রা জুলাই 'Celluloid Manufacturing Company of Albany' নামের মধ্যেই U. S. Patent Gazette-এ প্রথম সেলুলয়েড শব্দের উল্লেখ পাওয়া যায়।

সেলুলয়েডের পূর্ণাঙ্গ অবস্থায় আসার ক্ষেত্রে ফেরিয়ার (C. M. Ferrier) ১৮৫৭ সালে, ওয়ার্নারকে (Leon Warnerke) ১৮৭৫ সালে, থিয়েবলট্ (Thiebault) এবং ব্যালানি (Georges Balagny) ১৮৮৩ সালে প্রভৃত কাজ করেন। যাই হোক দীর্ঘ যাত্রার পর, আজকের সেলুলয়েডের মোটামুটি অবয়ব আমরা দেখতে পাই ১৮৮৬ সালে ইস্টম্যান (George Eastman: 1854-1932) এবং ওয়াকারের (W. H. Walker) তৈরী ফিল্মে।

ইস্টম্যান চলচ্চিত্র সম্ভাবনার ক্ষেত্রে যে অবদান রেখে গেছেন বাস্তবিকই তার তুলনা মেলা ভার। যান্ত্রিক উপায়ে ফিল্মের ওপর রাসায়নিক

প্রলেপ লাগানোর ব্যবস্থা করেন ১৮৭৯ সালে ; নমনীয় নেগেটিভ ফিল্ম চালু করেন ১৮৮৪ সালে এবং ১৮৮৮ সালে তৈরী করেন স্বচ্ছ ফিল্ম। বিশ্বের প্রথম রোল ফিল্ম ক্যামেরা 'কোডাক' উপহার দেন ওই সময়ে।

কারবাট (John Carbutt) নামে এক অ্যামেরিকাবাসী ইংরেজ বৈজ্ঞানিকও সমসময়ে স্বচ্ছ সেলুলয়েড ফিল্ম তৈরী করতে সক্ষম হন।

ফটোগ্রাফীর জনপ্রিয়তার দ্রুত উন্নতির মূলে অন্যতম ব্যক্তি জর্জ ইস্টম্যান, ফটোগ্রাফী শিল্পের (Industry) ক্ষেত্রেও এক নাটকীয় উন্নতি ঘটাতে সক্ষম হন। পরীক্ষা-নিরীক্ষা, গবেষণার বিস্তৃত পটভূমি সৃষ্টি করার জন্যই শুধু নয়, চলচ্চিত্রের এই বিপুলায়তন বর্তমান আঙ্গিকের দিক থেকেও ইস্টম্যান এক স্মরণীয় নাম। ১৯২৩ সালে, ১৬ মিলি মিটার ফিল্ম—ক্যামেরা, প্রজেক্টার এবং রঙ্গীন ছবি তৈরীর ক্ষেত্রে তাঁর সুদূরপ্রসারী ভূমিকা ছিল।

১৮৮৭ সালে, গুডউইন (Rev. Hannibal Goodwin : 1822-1900) নামে এক বৈজ্ঞানিক, পাতলা স্বচ্ছ সেলুলয়েড ফিল্ম তৈরীর পদ্ধতি পেটেন্ট করার জন্য আবেদন করলেন। এর অনুমোদন পেতে হয়ে গিয়েছিল ১৮৯৮ সাল। এদিকে, ইস্টম্যান কোম্পানী ১৮৮৯ সাল থেকেই ফিল্মের বাজারে প্রায় একাধিপত্য বিস্তার করে ফেলেছিল। ফলে গুডউইন পেটেন্টের মালিক আন্‌স্কো কোম্পানীর সাথে, ইস্টম্যান কোডাক কোম্পানীর শুরু হয় আইন যুদ্ধ। বারো বছর বাদে ইস্টম্যান কোম্পানী পঞ্চাশ লক্ষ ডলারের বিনিময়ে আন্‌স্কোর সাথে এক চুক্তিতে আসতে সক্ষম হয়।

এই ভাবেই গুডউইন—ইস্টম্যানের হাত ধরে শুরু হল সেলুলয়েড ফিল্মের পথ চলা। পরবর্তীকালে সহজদাহ্য সেলুলয়েডের পরিবর্তে ব্যবহৃত হ'ল নিরাপদ সেলুলোজ এ্যাসিটেট (Cellulose Acetate)। সেটা ছিল ১৯৩০ সাল।

জর্জ ইস্টম্যান

কোডাক ক্যামেরা-রোল ফিল্ম

ইজাক
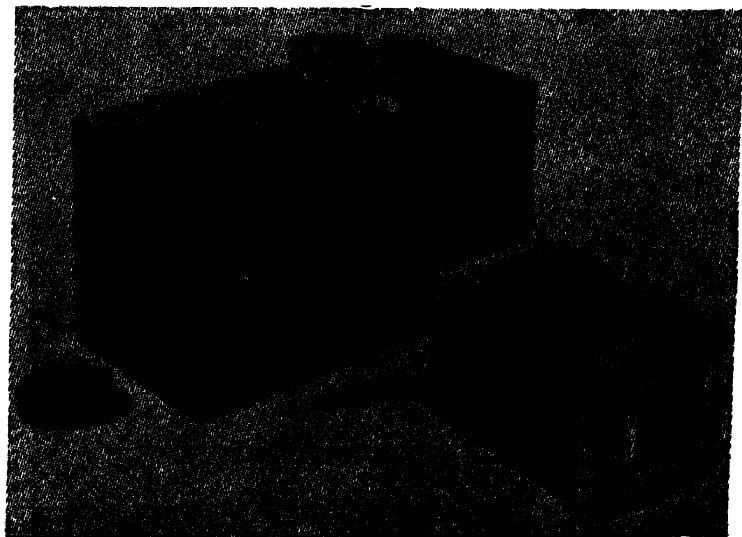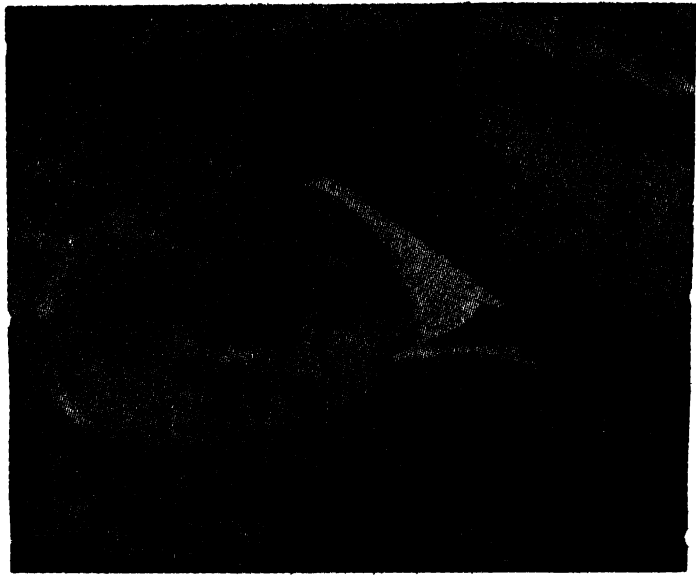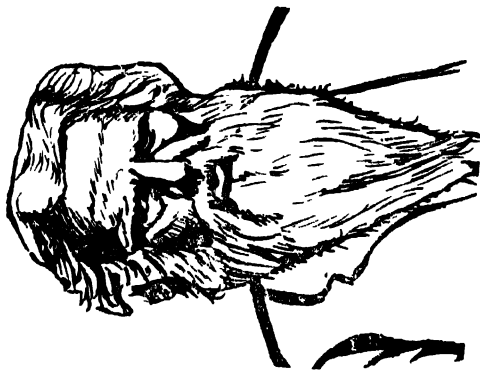
এডওয়ার্ড মস্ মেব্রি

ঘোড়ার ছবি

চলমান ছবি তোলার ব্যাপারে এক চাঞ্চল্যকর কাহিনীর নায়ক, ইংরেজ ফটোগ্রাফার মেব্রিজ (Edward James Muybridge : 1830-1904)। মেব্রিজ মার্কিন সরকারের পক্ষে উপকূলবর্তী অঞ্চল এবং রাশিয়ার কাছ থেকে সদ্য কেনা 'আলাস্কা'-র ছবি তোলার কাজ করছিলেন। এই সূত্রেই তাঁর সাথে আলাপ হয় ক্যালিফোর্নিয়ার গভর্নর স্ট্যাণ্ডফোর্ডের (Leland Standford) সাথে। স্ট্যাণ্ডফোর্ডের সাথে বন্ধুবান্ধবদের বাজী হয়, ছুটন্ত অবস্থাতেও ঘোড়ার চারটে পা মাটি ছুঁয়ে থাকে কিনা এই নিয়ে। স্ট্যাণ্ডফোর্ড প্রমাণ করে দিতে চাইলেন যে ছুটন্ত অবস্থাতে অন্তত কিছুক্ষণের জন্য ঘোড়া শূন্যে অবস্থান করে। স্ট্যাণ্ডফোর্ডের অনুরোধে ১৮৭২ সালে মেব্রিজ গেলেন ক্যালিফোর্নিয়ার স্যাক্রামেণ্টো ঘোড় দৌড়ের মাঠে। তখনকার দিনে এটা কিন্তু ছিল একটা অসাধারণ প্রয়াস। সমসাময়িক একটা সাধারণ স্ট্যাণ্ড ক্যামেরা নিয়ে, ডার্ক-রুমের জন্য একটা তাঁবু খাটিয়ে মেব্রিজ প্রস্তুত হলেন। সে সময়ে সবচেয়ে কম এক্সপোজারের (Exposure) ক্যামেরা ছিল ১/১২ সেকেণ্ডের মতো সময়ের ওপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ আজকের ছোটদের ব্রাউনি ক্যামেরাও এর দ্বিগুণ ক্ষিপ্র। স্বাভাবিক ভাবেই অত দীর্ঘ এক্সপোজারের ক্যামেরার খুব কাছ দিয়ে ছুটে যাওয়া ঘোড়ার প্রতিচ্ছবি একদমই গ্রহণ করা সম্ভব হ'ল না। মেব্রিজ হতাশ হয়ে পড়লেও স্ট্যাণ্ডফোর্ড হাল ছাড়লেন না। তিনি মেব্রিজকে উৎসাহ দিতে থাকলেন।

এর পরই মেব্রিজ, ল্যারকিন (Major Harry Larkyn) নামে এক ব্যক্তিকে খুন করেন। শোনা যায় মেব্রিজের স্ত্রীর সঙ্গে ল্যারকিনের অবৈধ সম্পর্ক এর জন্য দায়ী। দিনটা ছিল ১৮৭৪ সালের ১৭ই অক্টোবর।

শনিবার ৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৭৫ এর 'নাপা ডেইলি রেজিস্টার' থেকে জানতে পারা যায়, ৫ই ফেব্রুয়ারী এই মামলার (The people of the State of California Vs. Edward Muybridge) নিষ্পত্তি হয়ে যায়। মেব্রিজ মুক্তি পান। এরপর মেব্রিজ বেশ কিছু দিন কাজ করতে পারলেন না। গতিশীল ছবির সম্ভাবনাও পিছিয়ে গেল প্রায় আরও পাঁচটা বছর।

মেব্রিজ হাল ছেড়ে দিলেও, স্ট্যাণ্ডফোর্ড হার মানতে রাজী ছিলেন না। তিনি রেলরোডের (Railroad Service) কাজে নিযুক্ত ইঞ্জিনীয়ারদের সাথে কথা বললেন। এদেরই মধ্য থেকে আইজাক (John D. Issac) নামে ফটোগ্রাফীর প্রতি আগ্রহী এক তরুণ ইঞ্জিনীয়ার, স্ট্যাণ্ডফোর্ডকে সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন। ইতিমধ্যে ফটোগ্রাফীর যান্ত্রিক এবং রাসায়নিক দিকেরও অনেক উন্নতি ঘটেছে। প্রায় একশ পাউণ্ড ওজনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, রবারের তৈরী শাটারের (shutter) ক্ষিপ্রতা দাঁড়িয়েছে ১/১০০০ সেকেণ্ডের মতো। এই ধরণের ক্যামেরা তৈরী করেছিলেন স্কেইফ (Thomas Skaife) নামে এক ইংরেজ বৈজ্ঞানিক। আইজাকের কাজ এর দ্বারা বিশেষ উপকৃত হ'ল। বৈদ্যুতিক চুম্বকের দ্বারা শাটারের ওঠা-নামার কাজ নিয়ন্ত্রিত করলেন আইজাক।

যাইহোক, অনেক যান্ত্রিক জটিলতার পর, একদিন স্ট্যাণ্ডফোর্ডের স্বপ্ন এবং আইজাকের পরিশ্রম সফল হ'ল। পরপর চব্বিশটা ক্যামেরা রেখে মেব্রিজ গতিশীল ঘোড়ার ক্রমান্বয়িক পর্য্যায়ের ছবি তুলতে সক্ষম হলেন। আইজাকের কাজ শেষ হ'ল। তিনি তাঁর রেললাইন পাতার কাজে ফিরে গেলেন। আর মেব্রিজ, আইজাকের সৃষ্ট পদ্ধতিতে গতিশীল প্রাণীর ছবি তুলে যেতে থাকলেন। আইজাকের কাছে ব্যাপারটা ছিল প্রযুক্তি বিজ্ঞানের একধাপ এগিয়ে যাওয়ার ব্যাপার, আর মেব্রিজের কাছে পেশা সাফল্যের প্রশ্ন।

পুরো ব্যাপারটায় স্ট্যাণ্ডফোর্ডের খরচ হল তখনকার দিনে প্রায় চল্লিশ হাজার ডলারের মতো। এবার স্ট্যাণ্ডফোর্ড বেরিয়ে পড়লেন তাঁর ছবির এ্যালবাম নিয়ে। গভর্ণর স্ট্যাণ্ডফোর্ডের ঘোড়ার ছবির খবর একদিন পেঁছিল মেসোনিয়ের (Jean Louis Messonier) কানে। তিনি ছিলেন ফ্রান্সের বৈজ্ঞানিক। স্ট্যাণ্ডফোর্ডের সাথে দেখা ক'রে ঘণ্টার পর ঘণ্টা খুঁটিয়ে দেখলেন ছবিগুলো। মেব্রিজের সাথেও আলাপ হ'ল মেসোনিয়ের। ক্রমান্বয়িক ছবিগুলোকে তিনি দিতে চেষ্টা করলেন গতি। মেব্রিজের ছবিগুলো স্বচ্ছ নকল (Transparency) তৈরী করে নিয়ে জোয়েট্রোপ ধরণের মেশিনে দেখাবার ব্যবস্থা করলেন মেসোনিয়ে। ইতিমধ্যে জোয়েট্রোপও বিশেষ উন্নত হয়ে উঠেছে বিশেষভাবে ফিলাডেল-

ফিয়াতে বৈজ্ঞানিক হেইলের প্রচেষ্টায়। এদিকে ফ্রান্সে ১৮৭৭ সালে রেনড (M. Emile Reynaud : 1844-1918) চলচ্চিত্র ভাবনার খুব কাছাকাছি গিয়ে পেঁছেছেন তাঁর প্র্যাক্সিনোস্কোপ (Praxinoscope) যন্ত্রের সাহায্যে। প্যারিসে, থিয়েটার হলে পর্দার পিছন থেকে হাতে আঁকা ছবি এই যন্ত্রের সাহায্যে প্রক্ষেপণ করে দেখান হ'ত। রেনড হাতে আঁকা ছবির বদলে ক্যামেরায় তোলা ছবি দেখানোর চেষ্টা করেন। এই যন্ত্রে ছিল একটা ঘূর্ণায়মান কাঁচের বৃত্তাকার চাক্তি যার ওপরে ছবি বসানোর ব্যবস্থা থাকত। একটা অস্বচ্ছ শাটার ছবির পিছন থেকে ফেলা জোরাল আলোকে আড়াল করে রাখত। কাঁচের পিছন থেকে আসা জোরাল আলো-ছবি আর শাটার এক সরল রেখায় আসলেই, খুব অল্প সময়ের জন্য শাটার উন্মুক্ত হয়ে ছবি প্রক্ষেপণ করতো এবং পরবর্তী ছবি চলে আসতো প্রক্ষেপণের অপেক্ষায়। দ্রুত এইভাবে প্রক্ষেপণ সৃষ্টি করতো ছবি নড়াচড়ার একটা বিভ্রম।

তবে মেব্রিজের সাথে এই ধরণের চলচ্চিত্র ভাবনার বাস্তবিকই কোন সম্পর্ক ছিল না। জোয়েট্রোপ বা প্র্যাক্সিনোস্কোপ যন্ত্রের সাহায্যে মেসোনিয়ে আপাত সম্পর্কহীন ছবিগুলোতে যেভাবে গতি সঞ্চার করতে সক্ষম হ'লেন, সমকালীন অবস্থায় তা বিজ্ঞান এবং শিল্প (Art) দুটো বিভাগকেই বিশেষ চমৎকৃত করেছিল। মেব্রিজের চলচ্চিত্র ভাবনার সাথে এইভাবেই প্রথম সাক্ষাৎকার ঘটেছিল। এবং এরকমও বলা যেতে পারে, এই ধরণের ঘটনার মধ্যে চলে আসাটাও মেব্রিজের পক্ষে ছিল একটা সমাপতনিক ব্যাপার মাত্র। ছুটন্ত অবস্থায় ঘোড়ার ছবি তোলার দায়িত্বও তিনি পালন করতে সক্ষম হয়েছিলেন আইজাকের অপরিহার্য সহযোগিতাতেই। মেসোনিয়ে এবং ফ্রান্সের অন্যান্য বৈজ্ঞানিকেরা মেব্রিজের তোলা ছবিগুলোর সম্ভাবনার কথা বুঝতে পেরেছিলেন এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে তার যাথার্থ্যও বোঝাতে চেস্টা করেছিলেন তাঁদের জুপ্র্যাক্সিনিস্কোপ (zoopraxiniscope) বা প্র্যাক্সিনোস্কোপ ইত্যাদি যন্ত্রের সাহায্যে। মেব্রিজ তাঁর পরবর্তী জীবনে সম্মান, খ্যাতি, অর্থ এমনকি পেনসিলভ্যানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের (Pennsylvania University) সহযোগিতা পেয়েও জীবজন্তুর গতি প্রকৃতি (Animal locomotion) ছাড়া অন্য কিছুর ছবি তুললেন না এবং শেষ যেভাবে

প্রদর্শিত হয়েছিল ঠিক সেভাবেই ছবি দেখাতে থাকলেন। ছবি গ্রহণ পদ্ধতি বা প্রদর্শন ব্যবস্থার উন্নতি দূরে থাকুক ব্যাপারটা আদৌ বিস্তৃতই হোল না। যাই হোক, মেব্রিজের কাজের দ্বারা অনুপ্রাণিত হলেন ফ্রান্সের শরীরবিদ্ মারে (Dr. E. J. Marey : 1830-1904)। মারে চাইছিলেন কম পরিশ্রমে মানুষের এবং জীবজন্তুর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আবদ্ধ এবং আন্দোলিত অবস্থার পরিমাপ করার উপায়। তিনি মেব্রিজের পদ্ধতিতে কাজ করার চেষ্টা করে দেখলেন পূর্ব নির্দিষ্ট গতিপথ ছাড়া জীবজন্তুর নড়াচড়ার ছবি তোলার পক্ষে ব্যাপারটা আদৌ গ্রহণযোগ্য নয়।

জ্যানসিন নামে (Pierre Jules Cesar Janssen : 1824 1907) মারের এক জ্যোতির্বেত্তা বন্ধু ১৮৭৪ সালের ডিসেম্বর মাসে শুক্রগ্রহ যখন সূর্যের সামনে আসে তার ছবি তোলার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি যে যন্ত্রের সাহায্যে এই ছবি তোলার চেষ্টা করেছিলেন সেটাকে আরও উন্নত করলেন মারে। এটা আকৃতিতে দেখতে হয়েছিল একটা বন্দুকের মতো। এই বন্দুকের ঘোড়া টানলেই গুলির বদলে নলের সামনে চলে আসত একটা বৃত্তাকার কাঁচের ওপরে ক্রমান্বয়ে বসান আলোক সংবেদনশীল নেগেটিভ। নলে বসানো লেন্সের ভেতর দিয়ে প্রতিফলিত বিষয়বস্তুর ছবি গ্রহণ করেই অতিদ্রুত ঘুরে গিয়ে জায়গা করে দিত পরবর্তী নেগেটিভের। বোধ হয় এর থেকেই পরবর্তী কালে চলচ্চিত্র গ্রহণের আর এক প্রতিশব্দ চালু হয়েছিল 'শ্যুটিং'।

জ্যানসিনের বন্দুকে প্রতি সেকেণ্ডে সত্তরটা (৭০) ছবি তোলা সম্ভব ছিল। ১৮৮৭ সালে মারে যখন এই যন্ত্রে নমনীয় ফিল্ম (Paper role film) ব্যবহার করলেন তখন এর ক্ষমতা দাঁড়াল সেকেণ্ডে একশ' (১০০) খানা ছবি। মারে বলেছিলেন যদি জুপ্র্যাক্সিনিস্কোপ প্রক্ষেপণ যন্ত্রের পিতা হয়, তবে তাঁর ক্যামেরাও ছিল আধুনিক মুভি-ক্যামেরার প্রপিতামহ।
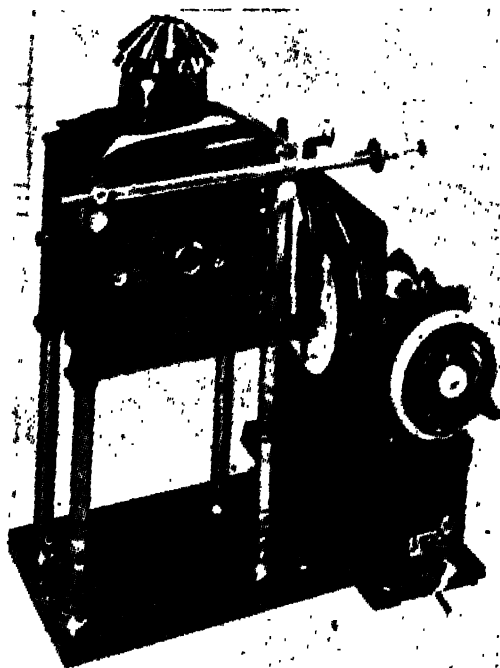
জুপ্র্যাক্সিনিস্কোপ

ই. জে. মারে

এমিল রেনড

ফটোগ্রাফিক গান
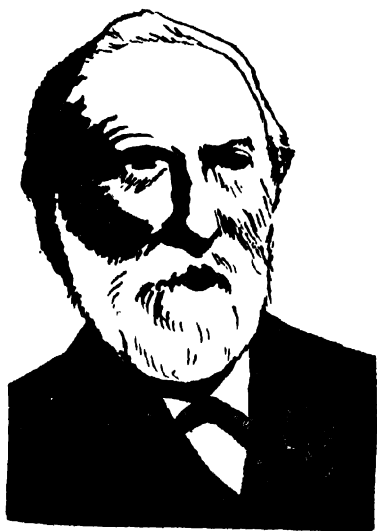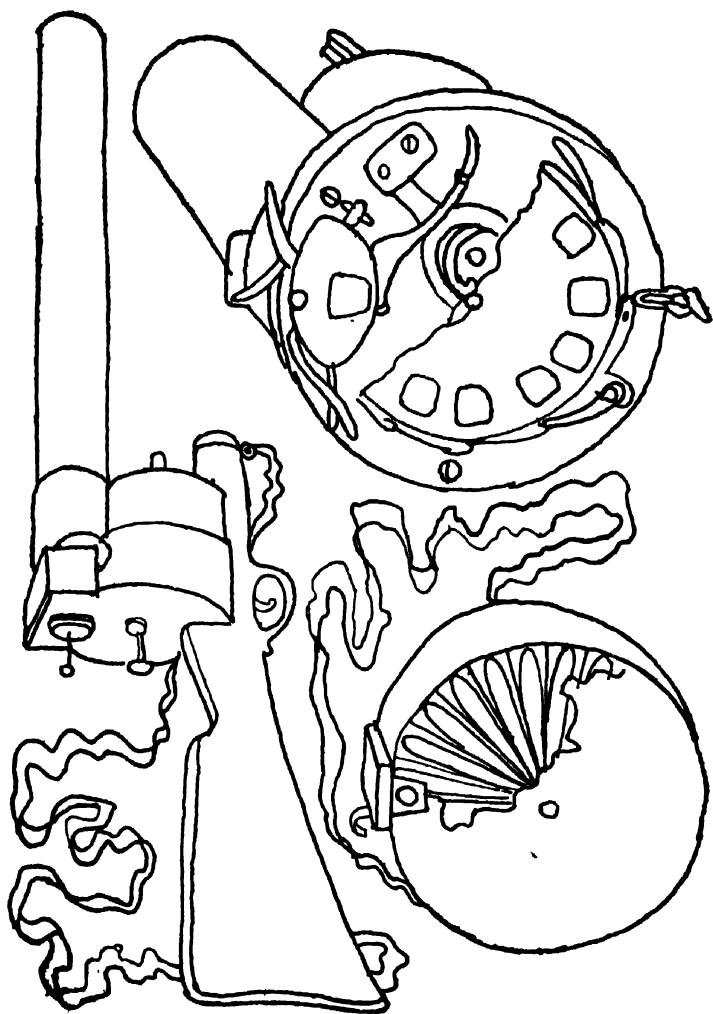
লেভিসন (Wallace Goold Levison) নামে এক অ্যামেরিকান বৈজ্ঞানিক, অষ্টাদশ শতকের প্রথম দিকে মেব্রিজের সাথে অনেক ছবি তোলেন তাঁর ঘরে তৈরী ম্যাগাজিন ক্যামেরা দিয়ে। লেভিসন, মারের পদ্ধতি অনুসারে একই দৃষ্টিকোণ থেকে গতিশীল বস্তুর ছবি তুলতে সক্ষম হন। লেভিসনের ক্যামেরাটা ছিল, বলা যেতে পারে ছবি তোলার জোয়েটোপ যন্ত্র। ১৩ই জুন ১৮৮৮ সালে ব্রুকলিন এ্যাকাডেমি অফ্ ফটোগ্রাফী (Brooklyn Academy of Photography) এবং ১৮৯১ সালের ১৬ই ফেব্রুয়ারী নিউইয়র্ক এ্যাকাডেমি অফ্ সায়েন্স (New York Academy of Science) তিনি এই বিষয়ে বক্তৃতা করেন।

১৮৮৫ সালে ইংল্যাণ্ডে গ্রীন (William Friese Greene) তার পিকাডেলির ছবির দোকানে দেখান গতিশীল বস্তুর ছবির ক্রমান্বয়িক পর্যায়। মারের পদ্ধতি অনুসারে কাঁচের প্লেটের ওপর তোলা হয়েছিল এই ছবি। ১৮৮৯ সালে গ্রীন তাঁর এক সহকর্মী ইভান্সের (Frederick Henry Evans) সহায়তায় এক জটিল যান্ত্রিক পদ্ধতিতে আলোক সংবেদনশীল ফিতের ওপর ছবি তুলতে সক্ষম হন। বস্তুতঃপক্ষে এটা ছিল রেনডের প্র্যাক্সিনোস্কোপেরই অনুকরণে আরেক পদ্ধতি। যাই হোক, গ্রীন এবং ইভান্সের কার্য্যাবলী ইংল্যাণ্ডে চলচ্চিত্র সম্ভাবনাকে যথেষ্ট প্রভাবিত করেছিল।

সমসময়ে ল্যাপ্রিন্স (Louis Aime Augustin Leprince: 1842-1890) নামে ফরাসী বৈজ্ঞানিক ইংল্যাণ্ডে বসে একই ব্যাপারে গবেষণা করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে বলে রাখা উচিত ল্যাপ্রিন্সের বাবা ছিলেন দ্যাগিউরের এক বিশেষ বন্ধু। মনে করা যেতে পারে, ল্যাপ্রিন্সের ফটোগ্রাফী ইত্যাদী ব্যাপারে আগ্রহ এই সূত্রেই এসেছিল। তিনি, নমনীয় ফিল্ম (Negative role film) দুই লেন্স ক্যামেরার মাধ্যমে ব্যবহার করে চলমান ছবি তোলার কথা ভাবছিলেন। নিউইয়র্কে অস্থায়ীভাবে বাস কালে তিনি এই ব্যাপারে ১৮৮৮ সালের ১০ই জানুয়ারী একটা

অ্যামেরিকান পেটেন্টও গ্রহণ করেন (Patent No. 376, 247)। সেখানে বলা হয়েছিল ঃ—

1) The successive production by means of a photographic camera of a number of images of the same object or objects in motion and reproducing the same in the order taking by means of a 'projector' or 'deliverer', thereby producing on the eye of the spectator similar impression to that which would have been produced by the original object or objects in motion.

2) Is an apparatus for producing 'animated' pictures, the continuous alternate operation of the film and its corresponding shutter or series of shutters.

3) As a means of producing 'animated' pictures on a photographic receiver provided with one or more lenses and one or more shutters, in combination with one or more intermittently operated film drums.

অবশ্য পুরো ব্যাপারটাই ছিল কাগজ কলমের ব্যাপার। কার্যকরী অবস্হাটা কেউই তখনও প্রত্যক্ষ করেননি। এর পর তিনি কিছু দিনের জন্য দেশে ফিরে গেলেন। সমস্ত ব্যাপারটা হঠাৎই শেষ হয়ে গেল ল্যাপ্রিন্সের সহসা অন্তর্ধানে। প্যারিসের কাছে ডিজ° (Dijon) নামে এক জায়গায় থাকতেন তাঁর ভাই। ভাই এর সাথে দেখা করতে গিয়েছিলেন ল্যাপ্রিন্স। ১৮৯০ সালে ১৬ই সেপ্টেম্বর তাঁকে শেষ দেখা যায় ঐ ডিজ°-এর রেল স্টেশনে একটা প্যারিসগামী ট্রেনে উঠতে। এর পর তাঁর আর কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি।

১৮৮৬ সালে অ্যামেরিকার নিউইয়র্ক শহরে, মেন্‌লো পার্ক (Menlo Park) ল্যাবরেটরিতে ফনোগ্রাফ (Phonograph) যন্ত্রের কাজ করছিলেন বিশ্ববিশ্রুত বৈজ্ঞানিক এডিসন (Thomas Alva Edison : 1847-1931)। বিভিন্ন ধরনের বড় বড় বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের সাথে সাথে এডিসন ফনোগ্রাফের মত ছোট জিনিস নিয়েও ব্যস্ত।

এর কয়েক বছর আগের ঘটনা, ইংল্যাণ্ডে বসে একটি তরুণ যুবক গভীর আগ্রহে এডিসনের প্রত্যেকটি কাজ, গবেষণার খবর রাখছিলেন। এই যুবকের নাম ডিকসন (William Kennedy Laurie Dickson : 1860-1935)। তিনি এতখানি মুগ্ধ ছিলেন যে, এডিসনের কর্মচারীদের মধ্যে স্থান পাওয়ার জন্য আবেদনও করেছিলেন। এডিসন এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেও, ডিকসন হাল ছাড়েন নি। প্রত্যাখ্যানের চিঠি হাতে নিয়ে একদিন সোজা এডিসনের মুখোমুখি এসে হাজির হলেন সুদূর ইংল্যাণ্ড থেকে নিউইয়র্কে। ডিকসনের উৎসাহের জয় হোল।

এরপর দুবছর কেটে গেল, ১৮৮১ সাল, এখন এডিসনের ল্যাবরেটরির ইলেকট্রিকাল টেস্টিং বিভাগের প্রধান ডিকসন। গ্যালভানোমিটার (Galvanometer) পরীক্ষা হচ্ছে; স্যার প্রিস (Sir William Preece) যাকে পরবর্তীকালে 'এডিসন প্রভাব' (the Edison effect) বলেছেন ইন্‌ক্যাণ্ডিসেণ্ট (Incandescent) আলো পরীক্ষাকালে।

১৮৮৬ সাল, ডিকসনের বয়স এখন ছাব্বিশ বছর, খুব ব্যস্ত। ইলেকট্রিক আর টেলিফোনের তার বসাতে হচ্ছে নিউইয়র্কের মাটির তলা দিয়ে। এমন সময় ডাক এলো, এডিসনের ব্যক্তিগত গবেষণার কাজে সাহায্য করার জন্য। তরুণ ইংরেজের বাসনা এতদিনে একটা বাস্তব রূপ নিতে চলল।

এডিসন তাঁর নবীন সহকারীকে দুটো বড় কাজের ভার দিলেন। প্রথমটা ছিল আকরিকের চৌম্বিক শক্তি সংক্রান্ত (magnetic seperation

of ores) আর দ্বিতীয়টা ছিল, পরবর্তীকালে ডিকসন যাকে বলেছেন ফনোগ্রাফের শব্দের সাথে জোয়েট্রোপের চলমান ছবির সমন্বয় সাধনের চেষ্টা ('to combine Mr. Edison's phonograph with a practical zoetropic moving figure device.") ।

এডিসন চলমান ছবি প্রচেষ্টার কার্যাবলীর সাথে মোটামুটি পরিচয় করে নিয়েছিলেন বিভিন্ন বিজ্ঞান পত্রিকার মাধ্যমে। এর মধ্যে প্রধান ছিল জার্মান বৈজ্ঞানিক আনশ্যুৎসের (Ottoman Anschutz : 1846-1907) তৈরী জোয়েট্রোপ ধরণের যন্ত্র। আনশ্যুৎসের যন্ত্রের বৈশিষ্ট্য ছিল যে এখানে ছবির ক্রমান্বয়িক পর্যায় প্রদর্শনে আলোর ব্যবস্থা ছিল বিশেষ ধরণের (Geisslertube)। এর দ্বারা ছবি অনেক সুন্দরভাবে দেখা যাচ্ছিল কারণ, এই আলো দ্রুত জ্বলে উঠতে এবং নিভে যেতে পারত। সরাসরি দেখার পক্ষে এই পদ্ধতি খুব সুবিধাজনক হলেও প্রক্ষেপণের পক্ষে বিশেষ কার্যকরী ছিল না। যাই হোক, জটিল যন্ত্রপাতি নিয়েও এই যন্ত্র তাচ্যাইস্কোপ (Tachyscope) নামে বার্লিন, প্যারিস আর লণ্ডনে সুনাম অর্জন করতে সক্ষম হয়। এডিসন এই ব্যাপারে ডিকসনের সাথে দীর্ঘ আলোচনা করলেন। এর পরের বছর অর্থাৎ ১৮৮৭ সালে প্রকৃতপক্ষে শুরু হ'ল অন্বেষণ।

এডিসনের আবিষ্কৃত ফনোগ্রাফ যন্ত্রে দুধরণের রেকর্ড ছিল। প্রথম দিকে চোঙার আকারে সিলিণ্ডার এবং পরে চাক্তির আকারে ডিস্ক। এই সিলিণ্ডার রেকর্ডের ওপরেই এডিসন, ডিকসনকে চলমান ছবি গ্রহণের চেষ্টা করতে বললেন। অর্থাৎ পাতলা পর্দাদ্বারা নিয়ন্ত্রিত পিনের পিছনে (Diaphragm controlled needle) শব্দগ্রহণ পদ্ধতি অনুসারে মোমের চোঙা না বসিয়ে, আলোক সংবেদনশীল রাসায়নিক পদার্থ মাখান চোঙা বা সিলিণ্ডারের ওপরে ছবি গ্রহণ করতে। এই ভাবেই একটা ক্যামেরার পিছনে শব্দগ্রহণের গতিতে একটা সিলিণ্ডারের গায়ে সর্পিল ক্রমান্বয়ে (spiral order) ছবি তোলার চেষ্টা হ'ল। কিন্তু কোন কার্যকরী সহায়তা এতে হ'ল না। শব্দগ্রহণের সিলিণ্ডার অব্যাহত গতিতে চললে কোন অসুবিধা নেই কিন্তু প্রতিচ্ছবি গ্রহণের ব্যাপারটা সেভাবে সম্ভব ছিল না।

এডিসন সেকেণ্ডে চল্লিশটা করে ছবি নেবার সিদ্ধান্ত নিলেন। যাতে

করে গৃহীত বিষয়বস্তুর গতি স্বাভাবিক থাকে। যদিও পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে ইতিমধ্যেই জানা গেছে সেকেণ্ডে ষোলটা ছবিই যথেষ্ট।

ডিকসনের সহায়তায় সিলিণ্ডারের ওপরে ছবি গ্রহণের কাজ এগিয়ে চলল। সেকেণ্ডে চল্লিশবার থেমে এবং চলতে চলতে ক্যামেরা যে ছবি গ্রহণ করতে সক্ষম হ'ল তার আকৃতি একটা লেড পেন্সিলের পিছনের পরিধির সমান। আসলে এডিসনের ধারণা ছিল ফনোগ্রাফ এবং চলচ্চিত্র এ দুটো অবিচ্ছেদ্য এবং চলচ্চিত্রকে ফনোগ্রাফের পরিপূরক হিসেবেই বিচার করা উচিৎ। মোমের সিলিণ্ডারের গায়ে অতিসূক্ষ্ম দাগের সাহায্যে যে ভাবে মানুষের কান ভরিয়ে দেওয়া সম্ভব, মানুষের চোখও একইভাবে ভরিয়ে দেবার কথা ভাবছিলেন এডিসন। যাই যোক, এডিসন এবং ডিকসন দুজনে এতখানি পরিশ্রম করলেন এটার পিছনে, যে তাঁরা বুঝতে পারলেন আর যাই হোক চলচ্চিত্রের সম্ভাবনা তাঁদের এই পদ্ধতিতে সম্ভব হবে না। এডিসন ধৈর্য আর শ্রমের কঠিন পরীক্ষার মুখোমুখি হলেন। প্রতিবার বিফলতা, তাঁকে যোগাতে থাকল নতুন প্রচেষ্টার উদ্দীপনা। সিলিণ্ডার মেশিনে ছবি উঠত ঠিকই, তবে সেগুলো বাস্তবিকই খুব খারাপ ছবি ছিল। অট্ (Fred Ott) নামে এডিসনের স্টুডিওর এক মেকানিক ছিল সেই ক্যামেরার সামনে প্রথম অভিনেতা। অট্‌কে এই সূত্রে পৃথিবীর প্রথম চলচ্চিত্র অভিনেতাও বলা যেতে পারে। তাঁর অভিজ্ঞতা জানতে পারা যায় সাক্ষীর জবানবন্দী থেকে (Thomas Alva Edison of the American Mutoscope and Biograph Company in equity No. 8289)।

অটের গায়ে জড়ান ছিল এক বিরাট সাদা কাপড়। একটা বেল্ট কোমরে আটকে কাপড়টাকে অনেকখানি ফুলিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তাঁকে একটা বেলুনের মত দেখতে লাগছিল। বিরাট কাপড়ের বেশ কিছুটা মাথায় জড়ান ছিল। বাঁদরের মত অঙ্গভঙ্গী করতে বলা হয়েছিল তাঁকে। অনেক সিলিণ্ডারের গায়ে ছাপা হতে থাকল অটের ছবি। হাস্যরসের মধ্য দিয়েই জন্ম হচ্ছিল চলচ্চিত্রের। এই সব অদ্ভুত কাণ্ডকারখানার সময়টা ছিল ১৮৮৮ সাল। এই সময়, এডিসন প্রতিচ্ছবি গ্রহণের মূল ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করলেন। তিনি দেখলেন জার্মানীতে তোলা হচ্ছে আণুবীক্ষনিক (microscopic) ছবি। দর্শনীয় স্থান, মূর্তি

ইত্যাদির ছবি ছোট ছোট টিউবের ভেতরে বসিয়ে, সামনে লেন্স (magnifying lens) লাগিয়ে সুন্দর খেলনাও তৈরী হচ্ছে। যাইহোক, একদিন এডিসন সিলিণ্ডারে ছবি তোলার ব্যাপারটা বন্ধ করে দিলেন। ছবি তোলার জন্য কাঁচের খণ্ড ব্যবহার করার পক্ষপাতী ছিলেন না এডিসন।

পরবর্তী ব্যাপারটা খুব উৎসাহব্যঞ্জক ছিল। ডিকসন, কারবাট (যার নাম আগে উল্লেখ কর‍া হয়েছে) নামে এক ফটোগ্রাফীর জিনিষপত্রের ব্যবসায়ীর কাছ থেকে ভারী সেলুলয়েড সীট যোগাড় করলেন। এই সেলুলয়েড পাতের ওপর লাগান ছিল আলোক সংবেদনশীল রাসায়নিক পদার্থ। কারবাটের প্রচেষ্টা ছিল কাঁচ খণ্ডের একটা বিকল্প চালু করা। সেলুলয়েডের এই খণ্ড ডিকসনের প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট ছিল না। তাছাড়া নতুন যন্ত্র তৈরীও করতে হল যা শাটার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। সেকেণ্ডে আট থেকে দশখানা ছবি উঠতে লাগল এই ক্যামেরায়। সেলু-লয়েডের ফিতের উপর দিকে ফুটো করে দেওয়া হ'ল যাতে সহজে চলাফেরা করতে পারে। এই সময়ে নিউইয়র্কের ওয়েষ্ট অরেঞ্জেও (West Orange) এডিসনের নতুন ল্যাবরেটরি তৈরীর কাজ শেষ হয়ে গেল। নতুন ল্যাব-রেটরির পাঁচ নম্বর ঘর ছেড়ে দেওয়া হ'ল শুধু মাত্র চলচ্চিত্রেরই জন্য। কড়া সতর্কতা নেওয়া হ'ল। ডিকসন এবং এডিসন ছাড়া পূর্ব অনুমতি ভিন্ন অন্য কারুর প্রবেশাধিকার ছিলনা এই ঘরে। এই ঘরে মাঝে মাঝেই যাদের ডাক পড়ত তাদের মধ্যে অটের নাম আগেই বলা হয়েছে, আর ছিলেন কেসার (C. H. Kayser) নামে এক দক্ষ কর্মী।

একটা পুরোন সিঙ্গার (Singer) সেলাই মেশিনকে ব্যবহার করা হ'ল সেলুলয়েডকে গতি দেবার জন্য। সেলুলয়েডের ফিতেকে উপর দিকে সারি করে ফুটো করে নেওয়া হয়েছিল আগেই। এবার সেই ফুটোর মধ্যে দেওয়া হ'ল অশ্বারোহীদের জুতোর পিছনে যে বহু কোণ বিশিষ্ট চাকা (Spur Wheel) থাকে সেই চাকা। যাতে করে স্পার হুইলের কাঁটাগুলো সেলুলয়েডের ছিদ্রের মধ্যে পর পর ঢুকে গিয়ে তাকে দিতে পারে সঙ্গতিপূর্ণ গতি, তার জন্য ব্যবহার করা হ'ল (Geneva Cross ; ঘড়ির যন্ত্রাংশ)। কারবাটের পাঠানো সেলুলয়েডের পাতকে ফালি ফালি করে কেটে নিয়ে ফিতে লম্বা করা হ'ল প্রয়োজন মত।

উইলিয়াম ফ্রিজ গ্রীন

অগাস্টিন ল্যাপ্রিন্স

টমাস আলভা এডিসন

উইলিয়াম কেনেডি লরি ডিকসন

ফে্ড অট্

কিছুদিন পর, ডিকসন দেখলেন এতেও সেল্‌লয়েডের ফিতে ঠিকমত চলাচল করতে পারছে না। তখন তিনি এর নীচের দিকেও ছিদ্র বা perforation এর ব্যবহার শুরু করলেন। আজকের তুলনায় সেই ফিল্ম যদিও ছিল খুবই ভারী এবং স্বল্প দৈর্ঘ্যের, তবু লক্ষ্য করার মত ব্যাপার এই যে, আজকের দিনের ফিল্মের আকৃতি এবং তার গতি-পদ্ধতির খুবই কাছাকাছি চলে এসেছিলেন এডিসনের গবেষণাগারের কর্মীরা। এডিসন-ডিকসনের পরবর্তীকালের গবেষকরা, যাঁরা চলচ্চিত্রের যান্ত্রিক দিকগুলোর উন্নতি ঘটিয়েছিলেন তাঁরা মোটামুটিভাবে এই ধারাটাকে অক্ষুণ্ণই রেখেছিলেন। বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক তাঁদের গবেষণা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করে দেখিয়েছেন কিভাবে তাঁরা আজকের চলচ্চিত্রের উপযোগী ফিল্মের কাম্য মানে এসে পেঁাছেছেন, তবে এই কাম্য মানে আসার উনচল্লিশ (৩৯) বছর আগেই এর মোটামুটি চেহারা, ওয়েষ্ট অরেঞ্জের পাঁচ নম্বর ঘরে ঠিক হয়ে গিয়েছিল, এমনকি প্রত্যেক ছবি (Frame) পিছু চারখানা (৪) ছিদ্র অবধি।

এইভাবে একদিন এসে গেল ১৮৮৯ সাল। এডিসনের কাছে খবর এল, বিখ্যাত 'কোডাক' নির্মাতা ইস্টম্যান এক ধরণের নমনীয় পাতলা ফিল্ম তৈরী করতে সক্ষম হয়েছেন। ভারী কাঁচের ওপর ছবি তোলার বদলে, সহজে ক্যামেরায় বহন যোগ্য ছবি তোলার মাধ্যম বার করার চেষ্টা তিনি অনেক দিন ধরে করছিলেন। কোডাক ক্যামেরায় এই ফিল্মে ছবি তুলে আবার ইস্টম্যান কোম্পানির কাছে ফেরৎ পাঠিয়ে দিতে হ'ত বাকি কাজগুলো করার জন্য। ব্যাপারটা সময়সাপেক্ষ হলেও রাতারাতি জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল এইভাবে ছবি তোলা। ফটোগ্রাফী দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে সক্ষম হয়েছিল সাধারণ মানুষের মধ্যে।

এডিসন, ডিকসনকে পাঠালেন এই ব্যাপারে খেঁাজ খবর নেওয়ার জন্য। ২রা সেপ্টেম্বর, ১৮৮৯ সালে ইস্টম্যান কোডাক কোম্পানির (Eastman Kodak Company) কাছে চলচ্চিত্র তৈরীর জন্য ফিল্মের অর্ডার এল। এটাই ইস্টম্যান কোম্পানির প্রথম চলচ্চিত্র তৈরীর জন্য ফিল্ম সরবরাহ।

এই ফিল্ম হাতে নিয়ে এডিসন-ডিকসনের কাজ শুরু হ'ল। এর অল্প কিছুদিন পরেই এডিসন চলে গেলেন প্যারিসে, বিশ্ব শিল্প মেলায়

যোগ দেবার জন্য ; সঙ্গে নিয়ে গেলেন তাঁর অসংখ্য আবিষ্কৃত জিনিসের পসরা।

ইউরোপ, এডিসনকে মুগ্ধ করতে পারেনি। রুবেন্স (Rubens), হাল (Hals), রেমব্রাঁ (Rembrandt), গোয়ার (Goya) ছবির দিকে তাকিয়ে এডিসন বোধ হয় ভাবছিলেন, পৃথিবীতে এক নতুন শিল্প মাধ্যমের জন্ম হতে চলেছে। এডিসন কারচারের আড়াইশো বছর আগেকার ম্যাজিক লণ্ঠনে জ্বেলে দিয়েছিলেন ইলেকট্রিক আলোর ধারা। সেই আলোকে পৃথিবীর কনিষ্ঠতম কিন্তু সবচেয়ে শক্তিশালী শিল্প মাধ্যমটির তখন পথচলা শুরু হতে চলেছে।

এদিকে ডিকসন প্রস্তুত হচ্ছিলেন এডিসনকে এক চমক দেওয়ার জন্য। ইতিমধ্যে ব্যাচেলার (Charles Batchelor) নামে কর্মীর সহায়তায় ১৮৮৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ডিকসন আরও বড় পরিসরের নতুন জায়গা তৈরী করে নিয়েছিলেন ওয়েষ্ট অরেঞ্জ ষ্টুডিওরই আরেক দিকে। পাঁচ নম্বর ঘর তাই খালি পড়েছিল। যেদিন এডিসন ইউরোপ থেকে ফিরলেন সেই দিনই ডিকসন তাঁকে সঙ্গে করে সোজা নিয়ে এলেন ষ্টুডিওতে। তাঁর অনুপস্থিতিতে জায়গা বদলের ব্যাপার দেখে অসন্তুষ্ট হলেও এডিসন বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে গেলেন, যখন দেখলেন পর্দায় প্রক্ষিপ্ত ছবিতে ডিকসন তাঁকে টুপি খুলে অভিবাদন জানিয়ে বলছেন—"Good morning Mr. Edison, glad to see you back. I hope you are satisfied with the kineto-photograph।" দিনটা ছিল ১৮৮৯ সালের ৬ই অক্টোবর।

এই ঘটনার মধ্যে বেশী গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হ'ল ছবি পর্দায় প্রক্ষেপণ এবং কম গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারটা হ'ল ফনোগ্রাফ রেকর্ডের আওয়াজের সাথে প্রক্ষিপ্ত ছবির সমন্বয় সাধন করে সবাক ছবি করার চেষ্টা। যাইহোক পৃথিবীর প্রথম চলচ্চিত্রটি ছিল সবাক। কারণ, পরবর্তীকালে American Mutoscope and Biograph Company-র সাথে মামলার সময় এডিসন বলেছিলেন সে সময়ে প্রক্ষেপণের কোন ব্যবস্থা ছিল না। এবং একথা অবশ্যই ঠিক যে এডিসন চোখ লাগিয়ে দেখার যন্ত্রেরই (Peep Show Box) বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। এর থেকে মনে হয়, এডিসন দু'ধরণের ব্যবস্থাই রেখেছিলেন। ডিকসন অবশ্য চিরকালই বলে

এসেছেন পর্দায় ছবি দেখানোর ব্যবস্থা, তাঁরা ১৮৮৮ সালের শেষদিক থেকেই করে ফেলতে সক্ষম হয়েছিলেন। ১৯২৪ সালের ৪ঠা মে ফ্রান্স থেকে একটা চিঠিতে তিনি লিখেছেন,— "The result of this work led next to the endeavour to synchronize the phonograph with the machine and project on to a screen 8' × 10'—which would have been more of course if the studio had been larger.

The taking camera was used to project all our pictures, or rather a duplicate machine. The taking sprocket wheel slipped off and a very slightly smaller one substituted to allow for the slight but perceptible shrinkage of the positive film—otherwise the perforations in film would not match the sprockets.

...So we have it that we projected in 1888 (end) with or without the phonograph, and to make money, as then thought, a nickel in the slot machine was put out by the hundreds to pay for these experiments..."

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, ১৯২১ সালের ডিসেম্বর মাসে, এডিসনের একটা লেখা থেকে দেখা যাচ্ছে—"The facts are that Dickson and I had a machine projecting on a screen 5 ft. square at the time we were making peep machines".

১৯২৪ সালে এই ব্যাপারে এক অনুসন্ধান হয় এবং এডিসন সেই সময় বলেন "I am very sure that we projected motion pictures on the screen, before we stopped making the peep hole machine...I cannot remember the case where I said there was no screen. If I made any such answer, I certainly misunderstood the question।"

এর থেকে মনে হয়, এডিসনের গবেষণাগারে সেই সময় ছবি প্রক্ষে-পণের কোনরকম ব্যবস্থা অবশ্যই ছিল। এর ছয় বছর পর চলচ্চিত্র পর্দায় প্রক্ষিপ্ত হতে থাকে সর্বসাধারণের জন্য।

চলচ্চিত্রের সেই আপাতসাফল্যের প্রশংসা এডিসন এবং ডিকসন উভয়েরই প্রাপ্য। এডিসনের ওয়েস্ট অরেঞ্জ ষ্টুডিওর পাঁচ নম্বর ঘরে যে শিশু চলচ্চিত্রের জন্ম হয়েছিল তার জন্যে এডিসন এবং ডিকসন দুজনেই পরস্পরের কাছে ঋণ স্বীকার করেছেন।

এডিসনের Peep show Machine-এর নাম রাখা হ'ল কিনেটোস্কোপ (kinetoscope)। এর ভেতরে ছিল ব্যাটারী চালিত একটি মোটর যা প্রায় পঞ্চাশ ফুট ফিল্ম ক্রমাগত বিভিন্ন পুলির সাহায্যে ঘুরিয়ে চলত। একটি দ্রুত ঘূর্ণায়মান শাটার, ছবির একেকটি ফ্রেমকে দৃষ্টিপথের সামনে আলোকিত করে তুলত।

চলচ্চিত্রের দুরূহ যাত্রাপথে এটা ছিল একটা সুদূর প্রসারী পদক্ষেপ। এডিসনের কর্মচারীরা কিনেটোগ্রাফ ক্যামেরাকে যথেষ্ট উন্নত পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। পঞ্চাশ ফুট ফিল্মের প্রতি ফুটে থাকত ষোলটা করে ছবি। সেলারস্, হেইল অথবা আইজাক-মেব্রিজের কারিগরী একটা স্থিরচিত্র গ্রহণের ক্যামেরার কাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল; তাঁদের ছবি ছিল গতিশীল বস্তুর তাৎক্ষণিক মুহূর্তের ছবি, যা চেষ্টা করছিল সার্বিক গতি গ্রহণের।

এডিসনের পরবর্তী সময়ের বেশ কিছুটা কেটে গেল ফনোগ্রাফ যন্ত্রের পিছনে। চলচ্চিত্র ভাবনা কিছুকাল স্থগিত রইল। এর পিছনে অবশ্য একটা মনস্তাত্বিক কারণ খুঁজে বার করা যেতে পারে। এডিসনের শ্রবণশক্তি ক্রমশ কমে আসছিল।

যাই হোক, ফনোগ্রাফ কিন্তু একটা নতুন ব্যবস্থা হিসেবে জনপ্রিয় হতে শুরু করল। যন্ত্রে পয়সা ফেলে, কানে চোঙ লাগিয়ে নামকরা অর্কেষ্ট্রার বাজনা শুনতে সবারই ভাল লাগত।

প্যারিসে খবর গেল এডিসনের ফনোগ্রাফ যন্ত্র লণ্ডনে পেঁাচেছে। প্যারিসেও এ জিনিসের একটা ব্যবসা ফাঁদার উদ্দেশ্যে, এক বিত্তবান ভদ্রলোক তাঁর বন্ধুকে পাঠিয়ে দিলেন কিছু ফনোগ্রাফ কিনে আনার জন্য। বন্ধুটি যথাসময়ে জিনিসপত্র নিয়ে ফ্রান্সে ফিরে এলেন। কিন্তু তার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ যেটা করলেন—সেটা হ'ল, বিজ্ঞানের যাদুকর এডিসনের সাথে যোগাযোগ করে এলেন। এই বন্ধুটি হলেন পাথে (Charles Pathe : 1863-1957) যার নাম পরবর্তীকালে চলচ্চিত্রের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে গিয়েছিল।

এদিকে ১৮৯১ সালের ১৩ই জুন 'Harper's Weekly' তে এডিসনের কিনেটোগ্রাফ ক্যামেরা এবং কিনেটোস্কোপ ছবি দেখার যন্ত্রের বিস্তারিত বিবরণ আর প্রশস্তি প্রকাশিত হ'ল। এর ব্যবসায়ীক সাফল্যের কথা ভেবে এডিসন এটার পেটেণ্ট নিয়ে নেবার সিদ্ধান্ত নিলেন। মূলতঃ উঁকি মেরে দেখার যন্ত্র কিনেটোস্কোপ নিয়েই তিনি, ২৪ শে অগাষ্ট, ১৮৯১ সালে পেটেণ্টের জন্য আবেদন করলেন। এডিসন চিত্র প্রক্ষেপণের প্রস্তাবটা এবারও উপেক্ষা করলেন। ডিকসন ছবি তুলে যেতে থাকলেন। তবে ব্যাপারটাতে যেন উৎসাহের অভাব হচ্ছিল। যদিও ইস্টম্যান কোম্পানী এবং এন্থনি স্কোভিল (Anthony Scoville) নামে আরেক সংস্থার গবেষকরা ফিল্মের মান উন্নত করছিলেন ক্রমশ। মনে রাখতে হবে কিনেটো-স্কোপের ছবির সাথে আজকের দিনের ছবির সাদৃশ্যের চেয়ে বৈসাদৃশ্যই ছিল বেশী। গতিশীল ছবি তখনও ছিল একটা কালো বাক্সে বন্দী এবং তা দেখতে পেত একেকবারে মাত্র একজন, ফুটোতে চোখ লাগিয়ে।

১৮৯৩ সাল, কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কারের চারশ বছর পূর্তি উপলক্ষে শিকাগো শহরে বিরাট উৎসবের তোড়জোড় চলছে। সেখানে হবে Great Columbian Exposition।

লম্‌বার্ড (Thomas Lombard) নামে এক ভদ্রলোক খুব চেষ্টা করতে লাগলেন, যাতে এই মেলায় কিনেটোস্কোপ দেখান যায়। তিনি ছিলেন American Phonograph Company র মালিক। কলোম্বিয়ান মেলার কর্মকর্তা থ্যাচারের (John Boyd Thatcher) প্রধান সহকারী গ্যামন (Frank. R. Gammon) এবং তাঁর শ্যালক র‍্যাফের (Norman Charles Raff) সাথে এ ব্যাপারে তিনি বিস্তারিত আলোচনা করলেন।

র‍্যাফের ওপর দায়িত্ব প'ড়ল এডিসনকে রাজী করানোর। বেশ কিছু কথাবার্তার পর এডিসন মত দিলেন এবং র‍্যাফ, গ্যামন আর লম্‌বার্ডকে নিয়ে গঠিত হ'ল কিনেটোস্কোপ কোম্পানী (Kinetoscope Company)।

বেশ কিছু কিনেটোস্কোপ মেশিন এবং ছবি তাড়াতাড়ি তৈরী করে ফেলার জন্য তৈরী হ'ল বিশ্বের প্রথম ফিল্ম স্টুডিও 'ব্ল্যাক মারিয়া' (Black Maria)। ১৮৯৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে স্টুডিও তৈরীর কাজ শেষ হ'ল। খরচ হ'ল তখনকার দিনে প্রায় ৬৩৮ ডলার (৬৩৭.৬৭)। 'ব্ল্যাক মারিয়া' স্টুডিও ছিল ঘূর্ণায়মান একটা পাটাতনের ওপরে তৈরী। সূর্যের আলোর দিক পরিবর্তনের সাথে সঙ্গতি রেখে স্টুডিও ঘুরতে সক্ষম ছিল। এছাড়া স্টুডিওর ছাদও খুলে দেবার ব্যবস্থা ছিল যাতে আলো যথেষ্ট ঢুকতে পারে। স্টুডিওর ভেতরে ছিল একদিকে একটা মঞ্চ, যার ওপরে ছবির পাত্র-পাত্রী হাজির হ'ত। অপর দিকে 'ডার্করুম'। ডিকসন, ব্ল্যাকমারিয়াকে কিনেটোগ্রাফিক থিয়েটার (The Kinetographic Theatre) নামে অনেক জায়গায় অভিহিত করেছেন।

স্টুডিও তো তৈরী হ'ল, ছবি কার তোলা হবে! মারি পিকফোর্ড (Mary Pickford) তখনও জন্মাননি আর চ্যাপলিনের (Charles Chaplin) বয়স তখন মাত্র তিন বছর। সেই অট্‌কে আবার আসতে হ'ল
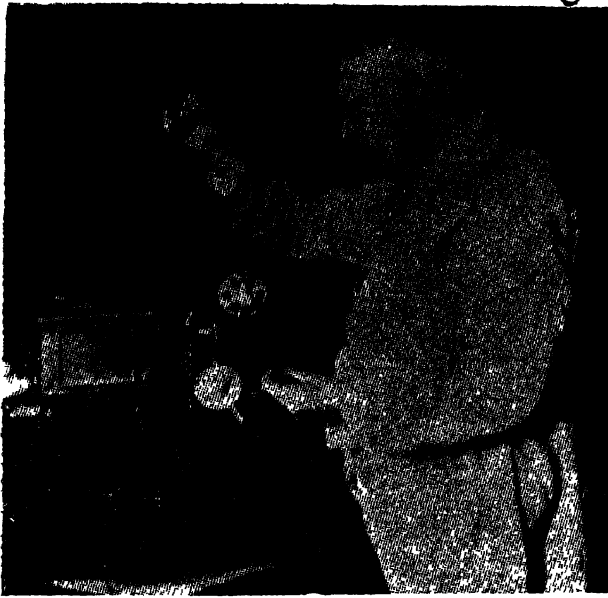
সম্পাদনায় এডিসন
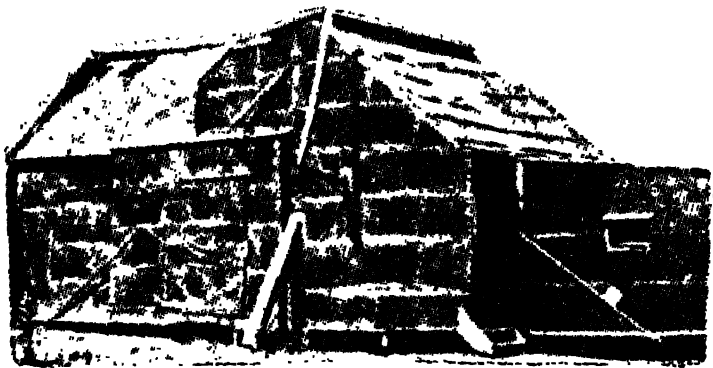
ব্ল্যাকমারিয়া স্টুডিও
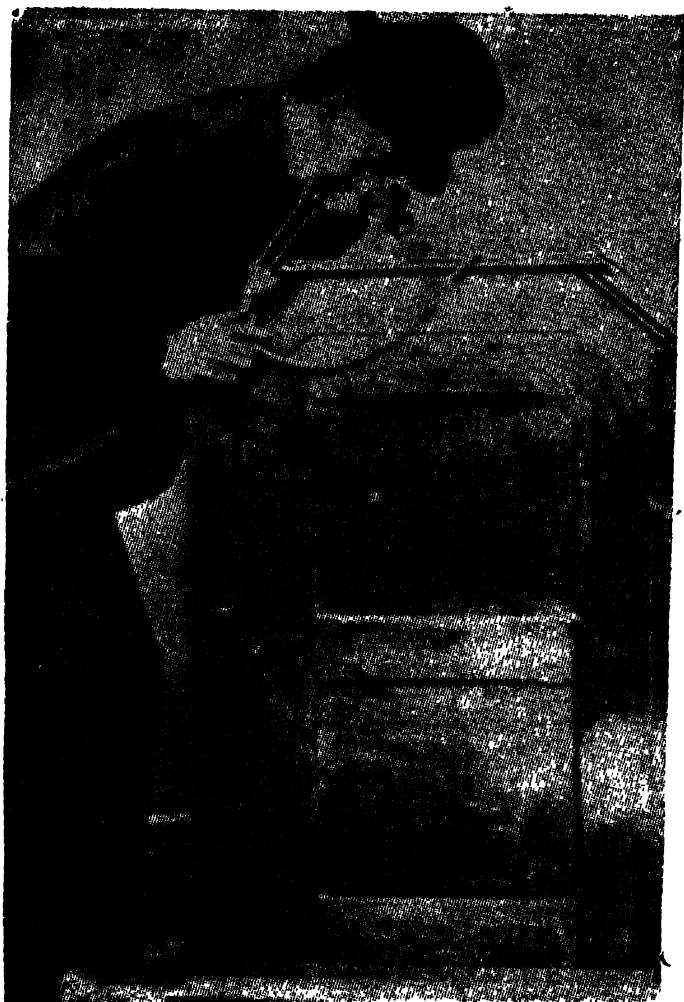
কিনেটোস্কোপ

ক্যামেরার সামনে। অটের হাঁচির ছবি তোলার সময় এবার একটু বৈচিত্র্য আনার চেষ্টা করা হ'ল। (অট্ অফিসে বসে আছেন চোখ বন্ধ করে, এমন সময় এক বেয়ারা এসে একটা মরিচের কৌটো নাকের সামনে নেড়ে দিয়ে যায়। ছবিতে প্রথম একটা গল্প (এক্ষেত্রে sequence বলা ভাল) তৈরীর প্রচেষ্টা দেখা গেল এবং এই ছবিতে প্রথম close-up এরও ব্যবহার করা হ'ল অ্যামেরিকায়।)

ডিকসন ক্যামেরা চালক, পরিচালক এবং রসায়নাগার কর্মী হিসেবে কাজ চালিয়ে যেতে থাকলেন। এইভাবে তিনি Trick Dog Teddy, The Gaiety Girls, Mexican Knife Thrower ইত্যাদি ছবি তুললেন।

এদিকে শিকাগোর বিশ্বমেলা যথাসময়ে শুরু হ'ল এবং একদিন শেষও হয়ে গেল। কিন্তু কিনেটোস্কোপ আর এসে পেঁছল না। কিনেটো-স্কোপের প্রথম বাণিজ্যিক প্রদর্শনী হয় নিউইয়র্কের, ১১৫৫ ব্রডওয়েতে (Broadway) ১৪ই এপ্রিল, ১৮৯৪ সালে।

যাই হোক, বিশ্বমেলাতে অন্যান্য জিনিসের মধ্যে জুপ্র্যাক্সিনিস্কোপ যন্ত্রে মেব্রিজের ঘোড়ার ছবি, অ্যান্শ্যুত্সের তাচ্যাইস্কোপের চলমান ছবি যথেষ্ট উৎসাহ যোগাল মানুষের মধ্যে। কিন্তু এগুলোর দিন ক্রমশ ফুরিয়ে আসছিল।

এই শিকাগো বিশ্বমেলাতেই ঘটল এক বিশেষ ঘটনা যার প্রভাব চলচ্চিত্রে সুদূর প্রসারী। হাজার হাজার দর্শকদের মধ্যে রিচমণ্ড (Rich-mond, Virginia) থেকে এসেছিলেন আরমাট (Thomas Armat · 1866-1948) নামে এক ভদ্রলোক তার ভাইকে সঙ্গে নিয়ে (J. Hunter Armat) ঘুরতে ঘুরতে তাঁরা এসে পড়লেন তাচ্যাইস্কোপ প্রদর্শনীর সামনে। তাচ্যা-ইস্কোপ দেখে বিশেষ মুগ্ধ হলেও আরমাটের মনে ঢুকে গেল অন্য ভাবনা। ম্যাজিক লণ্ঠনের মত যদি এটাকে প্রক্ষিপ্ত করা যেত, তাহলে অনেক লোক একসাথে দেখতে পেত।

ঘটনাচক্রে তাচ্যাইস্কোপ আর আরমাটের সাক্ষাৎকার, পরবর্তীকালে বিশেষ সাহায্য করেছিল চলচ্চিত্রকে দ্রুত তার গন্তব্যস্থলের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে।

১৮৯৪ সালেই আবার এক ঘটনা ঘ'টল। আমেরিকার নর্থক্লিফে (Northcliffe Virginia) থাকতেন ল্যাথাম পরিবার। ল্যাথামদের ওষুধের ব্যবসা ভাল চলছিল না। ব্রডওয়েতে কিনেটোস্কোপের প্রদর্শনী দেখে এই ব্যবসা শুরু করার কথা ভাবলেন গ্রে (Grey Latham), অট্‌ওয়ে (Otway Latham) দুই ভাই। এডিসন কোম্পানীর সাথে যোগাযোগ করে গ্রে ল্যাথাম তাঁদের রাজীও করে ফেললেন এ ব্যাপারে। আর এই-ভাবেই গ্রে, অট্‌ওয়ে ছাড়া টিলডেন (Samuel J. Tilden), রেকটরকে (Enoch Rector, এডিসনের প্রাক্তন কর্মী) নিয়ে তৈরী হ'ল কিনেটোস্কোপ প্রদর্শনী সংস্থা (Kinetoscope Exhibition Company)।

যে বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে ল্যাথাম ভাইরা কিনেটোস্কোপকে কাজে লাগাতে চেয়েছিলেন তা হ'ল তখনকার দিনে অন্যতম জনপ্রিয় খেলা মুষ্টি-যুদ্ধ। কয়েকদিন বাদেই ছিল লিওনার্ড (Michael Leonard) আর কাশিং (Jack Cushing) এর মধ্যে বাজীর লড়াই। এই যুদ্ধের ছবি তোলার জন্য, রেকটর কিনেটোস্কোপ নিয়ে প্রচুর পরিশ্রম করলেন। কিনেটো-স্কোপের কার্য্যকরী ক্ষমতার বিশেষ উন্নতি ঘটল। ১৫০ ফুট ফিল্ম এক-সাথে গ্রহণ করতে সক্ষম হ'ল যন্ত্র।

যন্ত্রের ক্ষমতা পরীক্ষার জন্য মুষ্টিযুদ্ধ সংক্ষিপ্ত আকারে গৃহীত হ'ল ১৮৯৪ সালের জুলাই মাসের কোন এক সকালে, এডিসনের 'ব্ল্যাকমারিয়া' স্টুডিওতে। পরে, আসল দশ রাউণ্ড ব্যাপী লড়াইয়ের ছয় রাউণ্ডের ছবি তোলা হ'ল দশ ফুট রিঙের মধ্যে। প্রায় এক হাজার ফুট ফিল্ম খরচ করা হ'ল। সেই সময় অবধি এটা ছিল সবচেয়ে দীর্ঘ চলচ্চিত্র। অগাষ্ট মাসে নিউইয়র্কে ছ'খানা বিশেষ কিনেটোস্কোপে দেখান শুরু হ'ল ল্যাথাম-দের ছবি। চলচ্চিত্র পিপাসু দর্শকদের ভীড় সামলাতে সেদিন পুলিশ ডাকতে হয়েছিল।

গ্রে-অট্‌ওয়ের বাবা উডভিল ল্যাথাম, (Woodville Latham : ? — 1911)। যিনি বেশী পরিচিত ছিলেন প্রফেসর ল্যাথাম হিসেবে, কিন্তু তখনও দেখেননি কিনেটোস্কোপ। সেপ্টেম্বর মাসে অট্‌ওয়ে

একদিন বাবাকে নিয়ে এলেন ছবি দেখাতে। ছবি দেখার পর প্রফেসরের সাথে আলোচনা হ'ল ছবিগুলো প্রক্ষেপণের ব্যবস্থা করা যায় কিনা এই নিয়ে। প্রফেসর প্রক্ষেপণের প্রস্তাবকে অত্যন্ত স্বাভাবিক সম্ভাবনায় গ্রহণ করলেন। যা সাধারণ চোখ দিয়ে দেখা যায় এবং যার প্রতিচ্ছবি গ্রহণ করা যায় তা নিশ্চয়ই প্রক্ষিপ্ত হতে পারে। প্রফেসর ব্যাক্তিগতভাবে রসায়নবিদ্ হ'লেও ফটোগ্রাফী এবং আলোকবিদ্যা সম্পর্কে মোটামুটি জ্ঞান তাঁর ছিল, কিন্তু গ্রে বা অট্ওয়ে চলচ্চিত্রের এ যাবৎ বৈজ্ঞানিক গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে আদৌ ওয়াকিবহাল ছিলেন না। আর এদিকে এডিসন প্রক্ষেপণের প্রস্তাবকে তাঁর ওয়েষ্ট অরেঞ্জের ল্যাবরেটরি নোটবুকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রেখে দিয়েছিলেন।

অট্ওয়ে ছিলেন প্রক্ষেপণের ব্যাপারে সবচেয়ে অসহিষ্ণু। তিনি চাইছিলেন ব্যাপারটা রাতারাতি ঘটে যাক। এডিসনের কারখানায় বার-বার যাতায়াত করতে লাগলেন এবং চেষ্টা করতে থাকলেন চলচ্চিত্রের সম্ভাবনায় উৎসর্গীকৃত প্রাণ ডিকসনের সাথে বন্ধুত্ব করার।

ল্যাথামদের গবেষণাগার তৈরী হ'ল ৩৫ নম্বর ফ্র্যাঙ্কফোর্ট স্ট্রীটে, স্কট বিল্ডিং-এ (35 Frankfort Street, Scott Building)। জায়গা পাওয়া গেল মাত্র ১২ × ১৫ ফুট, যা ছিল প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম। যাই হোক এই স্বল্প জায়গাতেই কাজ শুরু হ'ল। নেটার (Raphael Netter) নামে এক অঙ্কনবিদ্ (draughtsman) নিযুক্ত হলেন প্রফেসর ল্যাথামের চিন্তাকে প্রতিকৃতি দেওয়ার জন্য। আর এই প্রতিকৃতিকে বাস্তব রূপ দিতে এলেন, এডিসনের এক প্রাক্তন কর্মী ফরাসী ভদ্রলোক লস্ট (Eugene Augusteen Lauste : 1857-1935) চলচ্চিত্রের যান্ত্রিক অগ্রগতিতে যার ছিল বিশেষ ভূমিকা।

অট্ওয়ে ব্যস্ত রইলেন ওয়েষ্ট অরেঞ্জ স্টুডিওতে। চলচ্চিত্রের উন্নতির পক্ষে যাবতীয় তথ্য এবং বৈজ্ঞানিক প্রস্তুতির খোঁজ খবর নিতে থাকলেন, যাতে করে বৃদ্ধ বাবা যত সহজে এবং তাড়াতাড়ি অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে পারেন।

ল্যাথামদের প্রাথমিক সাফল্য, লিওনার্ড এবং কাশিং এর মুষ্টিযুদ্ধের ছবি তাদের উৎসাহিত ক'রল এই জাতীয় ছবি তৈরীর ক্ষেত্রে। এর ফলে আবার তৈরী হ'ল করবেট (James Corbett) এবং কার্টনের (Pete

Courtney) মুষ্টিযুদ্ধের ছবি। কর্‌বেট ছিলেন খুবই সুদর্শন এবং তাঁর বিশেষ পরিচিতি ছিল Gentleman Jim নামে। কর্‌বেটের সাথে ল্যাথামদের চুক্তি হ'ল, যাতে অন্য কোন কোম্পানী কর্‌বেটের ছবি তুলতে না পারে। কর্‌বেট পৃথিবীর প্রথম চিত্র তারকা যিনি চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করলেন।

রেকটর এর আগের ছবি তোলার সময় শুধুইমাত্র ঘটনার ছবি তুলে-ছিলেন। এবার কর্‌বেটের জনপ্রিয়তা কাজে লাগালেন তিনি। ছয় রাউণ্ড ব্যাপী এই লড়াই এর প্রত্যেক রাউণ্ড বা পর্যায় ছিল এক মিনিট স্থায়ী এবং শেষ পর্যায়ে করবেটের মুষ্ট্যাঘাতে কার্টনের পতন এইভাবে রেকটর ঘটনাকে চলচ্চিত্রের উপযোগী করে ছকে ফেললেন। ছবি সাংবাদিকতার দায়িত্ব অতিক্রম করে একধাপ এগিয়ে এল।

ক্রমশ র‍্যাফ-গ্যামনদের সংস্থা কিনেটোস্কোপ কোম্পানীও উৎসাহিত হ'ল এই জাতীয় ছবি তৈরীর জন্য। চলচ্চিত্র ব্যবসায়ে প্রতিযোগিতার সূত্রপাত ঘটল। এলেন অ্যানাবেল (Annabelle Moore) নামে এক মঞ্চের নর্তকী, তিনি তাঁর প্রতিভা উন্মুক্ত করলেন এডিসনের স্টুডিওতে সেই পঞ্চাশ ফুট ফিল্মের সামনে। মঞ্চে নৃত্যের সময় বিভিন্ন রঙের আলো ব্যবহার করে যেভাবে নাচকে আকর্ষণীয় করে তোলা হয়, এডিসনের ছবির প্রত্যেকটি ফ্রেমকে হাতে রঙ্‌ করে সৌন্দর্য সৃষ্টির চেষ্টা করা হ'ল। যদিও এই পদ্ধতি সহজসাধ্য ছিল না, তবুও চলচ্চিত্র রঙীন করে তোলার এটাই ছিল প্রথম অবৈজ্ঞানিক রঙীন প্রয়াস।

এদিকে অট্‌ওয়ে ডিকসনের সাথে দিনের পর দিন আলোচনা চালিয়ে যেতে থাকলেন প্রক্ষেপণ পরিকল্পনা নিয়ে। ডিকসন সম্ভবতঃ ল্যাথামদের কাজ সম্পর্কে কিছু জানতেন না। তিনি চলচ্চিত্রকে পর্দায় ফেলার উপযুক্ত করে তোলার জন্য প্রচেষ্টা চালাচ্ছিলেন কলোম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা-গারে। কিনেটোস্কোপের ১৩ ইঞ্চি ব্যাসের শাটারের ১/৮ ইঞ্চি ফাঁক দিয়ে ছবি প্রক্ষেপণের ব্যাপারটা সুবিধাজনক হচ্ছিল না। আলোর উৎস হিসেবে তিনি ব্যবহার করছিলেন জাইস্‌ আর্ক (Zeiss focus arc lamp)। এ ব্যাপারে তিনি প্রফেসর মানের (Prof. Riborg Mann) সাথে কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন, এই সমস্ত কথা তিনি অট্‌ওয়েকে জানালেন। ডিকসনের এই যাবতীয় প্রচেষ্টা আদৌ গোপন ছিল না। কিন্তু ব্যাপারটা অন্যরকম

ভাবে এডিসন আর এডিসনের ম্যানেজার গিলমোরের (William E. Gilmore) কানে পেঁছিল।

র‍্যাফের কিনেটোস্কোপ কোম্পানীও বাজারের চাহিদা দেখে বুঝতে পারছিল চলচ্চিত্র প্রক্ষেপণের একটা আশু প্রয়োজন, যা ল্যাথামরা অনেক আগেই বুঝেছিলেন। গতিশীল ছবি উঁকি মেরে দেখার কালো বাক্স থেকে মুক্তি পেতে চাইছিল।

ক্রেতাদের এই চাহিদার কথা র‍্যাফ যথাসময়ে এডিসনকে জানালেন। কিন্তু একসাথে অনেক লোক ছবি দেখার সুযোগ পেলে ছবির ব্যবসা খারাপ হতে পারে ভেবে, এডিসন এবারেও এ ব্যাপারে উদ্‌যোগ করলেন না। কিন্তু বারবার র‍্যাফ একই অনুরোধ জানানোর ফলে একদিন বাধ্য হয়ে সম্মত হলেন।

এখন একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটল। এডিসনের চলচ্চিত্র বিষয়ক যাবতীয় ব্যাপারের সহকারী এবং পরামর্শদাতা ডিকসনকে এ ব্যাপারে কিছুই জানানো হ'ল না। এডিসন, প্রক্ষেপণ সংক্রান্ত কোন কাজ নিজের স্টুডিওতে করলেন না। কেইসার (Charles H. Kayser) নামে এক দক্ষ কর্মীকে পাঠালেন কিনেটোস্কোপ কোম্পানীর অফিসে (New York Postal Telegraph Building) গিয়ে কাজ করার জন্য।

কেইসার দিনের পর দিন পরিশ্রম করতে থাকলেন। কিন্তু কাজ বিশেষ কিছু এগুল না। এদিকে ঘটনাটা যখন ডিকসনের কানে গেল, তখন তিনি স্বাভাবিকভাবেই বিশেষ আহত হলেন।

ল্যাথামরা ডিকসনকে অনুরোধ করতে থাকলেন তাঁদের কোম্পানীতে যোগদানের জন্য। তাঁদের পরিকল্পনা সাফল্যের পর এক চতুর্থাংশ লাভও তাঁরা ডিকসনকে দিতে চাইলেন। ডিকসন এই প্রস্তাবে ইতস্তত করলেন। তিনি তখন এডিসনের কোম্পানীতে সপ্তাহে তিরিশ ডলার পারিশ্রমিকে কাজ করছেন। তখনকার দিনে টাকাটা যথেষ্ট লোভনীয় অংকই ছিল। এছাড়া এডিসনের চলচ্চিত্র ব্যবসা থেকে একটা লাভের অংশ পাবার সম্ভাবনাও তাঁর ছিল।

১৮৯৪ সালের ডিসেম্বর মাসে প্রফেসর ল্যাথাম চলচ্চিত্র প্রক্ষেপণের ব্যবসাকে বিশেষ গুরুত্ব দিলেন, কিনেটোস্কোপ এক্সিবিশন কোম্পানী থেকে এটাকে আলাদা করে। নতুন কোম্পানীর নাম হ'ল লাম্‌ডা (Lambda

Company)। নতুন কোম্পানীতে ল্যাথামরা ছাড়া বাইরের কোন অংশীদার রইলেন না।

ল্যাথামদের গবেষণার কাজ পূর্ববর্তী পদ্ধতি অনুসারেই এগুচ্ছিল। এইভাবে কাজ করতে করতে তাঁদের মনে হ'ল কিনেটোস্কোপের অবিরাম ফিল্মের গতি যে পরিমাণ আলোর অপচয় ঘটায়, তা প্রক্ষেপণের পক্ষে উপযুক্ত অবস্থা সৃষ্টি করতে অসমর্থ হচ্ছে। ফলে প্রফেসর মনে করলেন আরও বড় আকারের ফিল্মের ব্যবহার এই আলোর অপচয় কমিয়ে আনতে পারবে।

একথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে, আজকের প্রক্ষেপণ ব্যবস্থার সঙ্গে সে সময়ের প্রক্ষেপণ প্রচেষ্টার বিশেষ কোন মিল ছিল না। একটার পর আরেকটা ছবির ফ্রেমকে বিষয়বস্তু থেকে প্রতিফলিত আলোর সামনে খুলে দেওয়ার যে পদ্ধতি ক্যামেরার ক্ষেত্রে গৃহীত হয়েছিল, তা বাস্তবিকই ফিল্মের আলোক সংবেদনশীলতা বা রাসায়নিক অবস্থার চাপে পড়েই। কিন্তু একই ব্যাপার যে প্রক্ষেপণের দ্বারা দৃষ্টিগ্রাহ্য করে তোলার জন্য প্রয়োজন, এটা তখনও গবেষকরা আন্দাজ করে উঠতে পারেন নি।

যাই হোক, ইস্টম্যান কোম্পানী থেকে আনা হ'ল এডিসনের কিনেটোস্কোপ-এর ফিল্মের প্রায় দেড়গুণ বড় মাপের ফিল্ম। লস্ট, এই ফিল্মের উপযুক্ত ক্যামেরা তৈরী করার পর দেখলেন, কিনেটোস্কোপের ব্যবস্থামত যদি ক্রমাগত ফিল্ম চলতে থাকে, তবে বিষয়বস্তুর গতি সঠিকভাবে গ্রহণ করা সম্ভব হচ্ছে না। অট্‌ওয়ে এ ব্যাপারে ডিকসনের সাথে পরামর্শ করলেন। ডিকসন বোধ হয় খোলাখুলিভাবে সব তখনও বলতে চাইছিলেন না। শুধু এইটুকু জানালেন সুইজারল্যাণ্ডের ঘড়ি নির্মাতারা জেনেভা ক্রস নামে একধরনের যন্ত্র ব্যবহার করেন যা, একটা ক্রমাগত আবর্তনশীল চালকদণ্ড থেকে সবিরাম গতি দিতে সক্ষম। খবরটা দ্রুত রেকটর এবং লস্টকে জানিয়ে দেওয়া হল।

১৮৯৫ সালে জানুয়ারী মাসের শেষ দিকে ল্যাথামদের ক্যামেরা মোটামুটি একটা চেহারা নিতে সক্ষম হ'ল। ফেব্রুয়ারী মাসের ছাব্বিশ তারিখে ডিকসন দেখতে এলেন নতুন ক্যামেরা। ক্যামেরায় ভরা রয়েছে নতুন বড় মাপের ফিল্ম। ক্যামেরার সামনে একটা ইলেকট্রিক লাইট জ্বেলে দিয়ে নাড়িয়ে দেওয়া হ'ল। ছবি তুলে তখুনি নেগেটিভ রাসায়নিক

প্রস্তুতিতে দেওয়া হ'ল। ব্যগ্র হয়ে সবাই অপেক্ষা করতে থাকলেন। ক্রমশ দোদুল্যমান আলোর ছবি ভেসে উঠল ফিল্মের গায়ে। আনন্দে অধীর হয়ে উঠলেন সবাই। কিন্তু এটাই কি আসল সমস্যা ছিল? প্রক্ষেপণের সমস্যা তখনও রয়েই গেল।

রেকটর, মুষ্টিযুদ্ধের ছবি তোলার সময় কিনেটোগ্রাফ ক্যামেরার কতকগুলো অসুবিধা লক্ষ্য করেছিলেন। এখনকার ক্যামেরায় তিনি সেটা এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করলেন। ক্যামেরায় অতিরিক্ত লম্বা ফিল্ম পুরলে, সময়ে সময়ে ক্যামেরার সাময়িক বিরতি আবার গতি, এর ফলে যে ঝাঁকুনির সৃষ্টি হ'ত তাতে ফিল্ম ছিঁড়ে যাবার খুবই সম্ভাবনা থাকত। বহু চিন্তা ভাবনা করার পর রেকটর একটা আল্গা ফিল্মের ফাঁস (loop) মতন তৈরী করলেন যা মূল ফিল্ম সরবরাহের গুচ্ছের পাশে আরেকটা ছোট আবর্তনের সৃষ্টি করল। এর ফল হ'ল অভাবনীয়। ফিল্মের অনাবশ্যক ঝাঁকুনির হাত থেকে সম্পূর্ণ রেহাই পেল ক্যামেরা। এই সামান্য ব্যাপারটার গুরুত্ব ছিল অসামান্য। ছোট্ট একটু আল্গা ফিল্মের এই ফাঁস সারা পৃথিবীতে পরিচিত হয়েছিল 'ল্যাথাম লুপ' (Latham loop) নামে।

ছোট ছোট ফিল্মের টুকরোর বদলে এবার থেকে প্রয়োজনীয় দৈর্ঘ্যের ফিল্ম ক্যামেরায় পোরা সম্ভব হ'ল। এডিসনের কিনেটোস্কোপের পঁয়তাল্লিশ থেকে পঞ্চাশ ফুট ফিল্মের প্রদর্শনের সময়সীমা ছিল মাত্র পনেরো সেকেন্ডের মত। মুষ্টিযুদ্ধের ছবি তোলার ক্ষেত্রে এই সময় কিছুটা বৃদ্ধি পেলেও এখন থেকে ছবির সময়সীমা প্রয়োজনমত নির্ধারণ করা সম্ভব হল।

এদিকে ওয়েস্ট অরেঞ্জে গিলমোর, ডিকসন ল্যাথামদের ঘনিষ্ঠতা দেখে ক্রমশ উত্তপ্ত হচ্ছিলেন। ১৮৯৫ সালের ২রা এপ্রিল, ব্যাপারটা একটা চূড়ান্ত রূপ নিল। এডিসন-গিলমোরের সঙ্গে ডিকসনের প্রচন্ড বাদ-বিতন্ডা হ'ল, যার ফলে ডিকসন তৎক্ষণাৎ এডিসন কোম্পানীর কাজে ইস্তফা দিয়ে চলে এলেন। ব্যাপারটার নিষ্পত্তি এখানেই হয় নি। এর পাঁচ বছর পরে, ১৯০০ সালের জানুয়ারী মাসের ২৯ তারিখে, অ্যামেরিকার সার্কিট কোর্টে মামলা পর্যন্ত হয় (United States Circuit Court of the Southern District of New York : Thomas A. Edison Vs. American Mutoscope Company in Equity No.

6928)। এডিসনের গবেষণাগারের তথ্যাবলী পাচারের অভিযোগ করা হয় ডিকসনের নামে।

ল্যাথামদের ক্যামেরা তৈরী হয়ে গিয়েছিল আগেই। ডিকসন, এডিসনের কাজ থেকে মুক্তি পাবার পর প্রজেক্টর তৈরীর কাজেও হাত লাগাতে পারলেন। মার্চ মাসের কোন একদিনে প্রফেসর ল্যাথাম এই যন্ত্রের নাম রাখলেন 'প্যান্টোপ্‌টিকন্‌' (Pantoptikon)।

ল্যাথামদের ক্যামেরা ছিল বহনযোগ্য। সেকেন্ডে চল্লিশটা ছবি গ্রহণ করে তাঁদের ক্যামেরা চিত্রায়িত বস্তুর স্বাভাবিক গতি অক্ষুণ্ণ রাখার চেষ্টা করেছিল। প্রয়োজনমত যে কোন দৈর্ঘের ফিল্ম গ্রহণ করার ক্ষমতা এই ক্যামেরার ছিল, একথা আমরা আগেই জেনেছি। প্রজেক্টরও দীর্ঘ ফিল্ম প্রক্ষেপণের ক্ষমতাসম্পন্ন ছিল। প্রক্ষিপ্ত ছবি ছিল একটা সাধারণ জানালার মাপে।

২৯শে এপ্রিল, ১৮৯৫ সাল, রবিবার সাংবাদিকদের কাছে প্রক্ষেপণ যন্ত্রের প্রদর্শন করা হ'ল পঁয়ত্রিশ নম্বর ফ্রাঙ্কফোর্ট স্ট্রীটে। পরের দিন 'নিউইয়র্ক সানে' (New York Sun) এই খবরটার সাথে আরেকটা চমকপ্রদ ব্যাপার ছিল, এডিসনের সাথে পত্রিকা সাংবাদিকের সাক্ষাৎকার। এডিসন, সাক্ষাৎকারে ল্যাথামদের যন্ত্রকে একদম নস্যাৎ করে দিলেন। তিনি বললেন এটা আদ্যোপান্ত কিনেটোস্কোপ ('That is the Kinetoscope. This strip of film with the pictures which you have here is made exactly as the film I use. The holes in it are for the spokes of the Sprocket, which I devised.'))।

তিনি আরও বললেন যে যদি ল্যাথামরা এই যন্ত্র প্রদর্শন করে এবং উন্নতি সাধন করার চেষ্টা করে তাহলে তিনি খুশী হবেন, কিন্তু অন্য নামে চালালে জালিয়াতী হবে এবং তিনি আইনের সাহায্য নেবেন ('If they exhibit this machine, improve on what I have done, and call it a Kinetoscope, that's all right. I will be glad of whatever improvement Mr. Latham may make.

If they carry the machine around the country, calling it by some other name, that's a fraud, and I shall prosecute whoever does it.')।

পরের দিন 'সান' পত্রিকার পাঁচ নম্বর পাতায় প্রফেসর ল্যাথামের চিঠি প্রকাশিত হল এর প্রতিবাদে। প্রফেসর কিনেটোস্কোপের সাথে প্যান্টোপ্‌টিকনের যাবতীয় বৈসাদৃশ্য উল্লেখ করলেন এবং এডিসনকে প্রায় প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভঙ্গীতে জানালেন যে যদি তিনি চলচ্চিত্র প্রক্ষেপণে সমর্থই হন, তা সর্বজনসমক্ষে প্রমাণ দিন।

কিন্তু একথা মনে করে নেওয়া ভুল হবে যে প্রক্ষেপণের সমস্যা তখন সম্পূর্ণভাবে মিটে গিয়েছিল। ল্যাথামদের প্রক্ষেপণ ভীষণভাবে বেঠিক ছিল। একথাও অবশ্য ঠিক যে, প্রয়োজনীয় আর্থিক আনুকূল্য তাদের ছিল না এবং তাড়াতাড়ি কিছু উপার্জন করার প্রবণতাও কিছু পরিমাণে দায়ী ছিল।

মে মাসেই তোলা হ'ল গ্রিফো ('Young Griffo') বনাম বার্ণেটের ['Battling (Charles) Barnett'] মুষ্টি যুদ্ধের ছবি। এবারের যুদ্ধ-ক্ষেত্র ছিল ম্যাডিসন স্কয়ার গার্ডেনের ছাদ (Madison Square Garden)। ১৮৯৫ সালের ২০শে মে, ১৫৩ ব্রডওয়েতে (153, Broadway) জনসাধারণকে দেখান হ'ল এই ছবি। ছবি প্রদর্শনের সময় ছিল প্রায় চার মিনিট ব্যাপী।

পৃথিবীতে প্রথমবারের মত জনসাধারণের চোখের সামনে চলচ্চিত্র প্রক্ষেপণের ঘটনা ঘটল। যদিও নৈপুণ্যের চেয়ে ব্যবসাটাই ছিল প্রধান।

কিনেটোস্কোপের বীজ ক্রমশ মহাবিশ্বে ছড়িয়ে পড়ল। ব্যাপারটা আস্তে আস্তে প্রবণতা থেকে চাহিদায় রূপান্তরিত হ'তে থাকল। কিনে-টোস্কোপ এবং ম্যাজিক লণ্ঠনের সমন্বয় সাধনের প্রচেষ্টা বহু ব্যক্তি একা একাই চালিয়ে যেতে থাকলেন।

১৮৯৫ সালের গোড়ার দিকে আমরা ল্যাথামদের প্রচেষ্টার কথা আগেই জানতে পেরেছি। ঠিক একইভাবে ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স বা অ্যামে-রিকারও বিভিন্ন জায়গায় অনেকে আলাদা আলাদা ভাবে কাজ করে যেতে থাকলেন। এ'রা পরস্পরের কাজ সম্পর্কে কেউ কোন খবরই রাখতেন না।

র‍্যাফ-গ্যামনদের প্রচেষ্টায় কিনেটোস্কোপের বিপুল প্রচার হ'ল। এ'দের থেকেই, জার্জিয়াদেস (George Georgiades) এবং ট্রাজেদিস (George Trajedis) নামে দুই গ্রীক ব্যবসায়ী ইংল্যাণ্ডে নিয়ে গেলেন কিনেটোস্কোপ। লণ্ডনের ব্রড ষ্ট্রীটে (Old Broad Street, E. C.) প্রদর্শিত হ'ল কিনেটোস্কোপের ছবি। এদিকে অ্যামেরিকান চলচ্চিত্র ব্যবসায়ী ওয়ার্নার ব্রাদার্সের (Warner Brothers) পক্ষে লায়নেল (Lionel Warner) অনেকগুলো কিনেটোস্কোপ ফ্রান্সে রপ্তানী করলেন। ১৮৯৪ সালের অক্টোবর মাসে প্যারিসে দেখান হ'ল যান্ত্রিক আশ্চর্য্য (20, Boulevard Poissoniere-এ)।

আরমাট এবং তাঁর বন্ধু ড্যানিয়েলের (T. C. Daniel) বিষয় সম্পত্তি সংক্রান্ত ব্যবসার অফিস (Real Estate Office) ছিল 'এফ' স্ট্রীটে (1313, 'F' Street)। ১৮৯৪ সালের গ্রীষ্মের কোন একদিন ট্যাব্ (H. A. Tabb) নামে এক ভদ্রলোক এখানে এসে হাজির হলেন। ট্যাব্ ছিলেন আরমাটের এক পুরোন বন্ধু। এ'র সাথে আবার কিনেটো-স্কোপ কোম্পানীর র‍্যাফ এবং গ্যামনেরও বন্ধুত্ব ছিল।

আরমাটের পেশা যাই হোক না কেন, বিজ্ঞানের প্রতি স্বাভাবিক কৌতূহল এবং অধ্যবসায়ে তিনি বহু জিনিস তৈরী করেছিলেন এবং বহু পেটেণ্টও তাঁর ছিল। ট্যাবের কাছ থেকেই আরমাট প্রথম কিনেটোস্কোপের প্রতি আগ্রহী হলেন। ট্যাব চাইছিলেন, আটলাণ্টায় আগামী কটন

স্টেট্‌সের মেলায় (Cotton States Exposition) কিনেটোস্কোপের একটা ব্যবসা ফাঁদার। আরমাট কিন্তু বুঝতে পারলেন কিনেটোস্কোপের চাইতে বেশী চাহিদা হবে ছবি পর্দায় ফেলে দেখান যায় এমন কোন যন্ত্রের। ট্যাব্‌ জানতেন র‍্যাফ-গ্যামনের কোম্পানীতে এডিসনের কর্মী কেইসারের কাজ কতখানি এগিয়েছিল। আরমাটকে তিনি ব্যাপারটা খোলা-খুলিভাবে জানালেন যে, এডিসনের প্রক্ষেপণের প্রচেষ্টার কোন বাস্তবিক চেহারা তখনও দেখা যায়নি। যদিও আরমাট তখন ভূগর্ভ রেলের চিন্তায় বিশেষ ব্যস্ত ছিলেন ('Conduit Electric Railway' Patent No. 521562 dated 19th June 1894) তবুও ব্যাপারটাকে গুরুত্ব দিয়ে, প্রক্ষেপণের জন্য চেষ্টা করার আশ্বাস দিলেন।

১৮৯৪ সালের অক্টোবর মাসে আরমাট এলেন ব্লিস স্কুলে (Bliss Scoool of Electricity)। প্রফেসর ব্লিস আরমাটকে বিশেষ সাহায্য করলেন আর্কল্যাম্পের আলোর তারতম্যের মাত্রা নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে, যা ছিল প্রক্ষেপণের পক্ষে অপরিহার্য। এই স্কুলেই আরমাটের সাথে আলাপ হ'ল জেনকিন্‌সের (C. Francis Jenkins : 1867-1934) সাথে। বেতার তরঙ্গ, দূরদর্শন, চলচ্চিত্র ইত্যাদী সংক্রান্ত বহু প্রবন্ধের লেখক হিসেবে 'ডেইলি প্রেস' (Daily Press) থেকে জেনকিন্‌সের নামের সাথে আরমাট অনেক আগে থেকেই পরিচিত ছিলেন। জেনকিন্‌সের বয়স তখন অল্প। পেশাগতভাবে তিনিও বিজ্ঞানের জগতের বাইরের লোক ছিলেন (Steno grapher United States Treasury Department)। ওয়াশিংটনে পেনসিলভ্যানিয়া এভিন্যুতে কলোম্বিয়া ফনোগ্রাফ কোম্পানীর প্রদর্শনীতে তিনি প্রথম কিনেটোস্কোপ দেখেন এবং এখান থেকেই র‍্যাফ-গ্যামনদের সাথে পরিচয় হয়। এই সময়ে তিনি কিনেটোস্কোপের একটা উন্নত সংস্করণও তৈরী করেন। এডিসনের যন্ত্রের সাথে এর তফাৎটা ছিল, কিনেটোস্কোপে আলোর মাত্রা কমানোর জন্য যে ঘূর্ণায়মান শাটারের ব্যবস্থা ছিল, এক্ষেত্রে ঘূর্ণায়মান বৈদ্যুতিক আলো লাগান হয়েছিল।

সমসময়ে জেনকিন্‌স, ফ্রান্সের হ্যার'র (Ducas du Hauron) অনুরূপ ঘূর্ণায়মান লেন্সের ক্যামেরা তৈরী করেন (হ্যার' এই Rotary Lens Camera-র পেটেন্ট নেন ১৮৬৪ সালের ২৫শে মে)।

ব্লিস স্কুলে আরমাট-জেনকিন্‌সের যোগাযোগ, চলচ্চিত্রের যান্ত্রিক

প্রয়োগবিদ্যার দিক থেকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। আরমাট. জেনকিন্‌সকে কিনেটোস্কোপের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত, ঘূর্ণায়মান বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবহার ছবি প্রক্ষেপণের ক্ষেত্রে ব্যবহার্য কিনা ভেবে দেখতে উৎসাহিত করলেন। ইতি-মধ্যে জেনকিন্‌স প্লাটোর যন্ত্রের নামানুসারে তাঁর উন্নত ধরনের কিনেটো-স্কোপের নাম দিয়েছেন 'ফ্যাণ্টোস্কোপ' (Phantoscope)। প্রতিচ্ছবি প্রক্ষেপণের ক্ষেত্রে এই যন্ত্রের প্রয়োগ পরিকল্পনা এবং রোটারি লেন্স ক্যামেরা দুটোর জন্যই জেনকিন্‌স পেটেণ্ট আবেদন করলেন।

আরমাট-জেনকিন্‌স যুগ্মভাবে কাজে নামার আগে একটা চুক্তিপত্র তৈরী হ'ল। ২৫শে মার্চ ১৮৯৪ সালে দুজনে এতে স্বাক্ষর করলেন। এর পরের দিনই প্রক্ষেপণের উপযুক্ত ফ্যাণ্টোস্কোপেরও পেটেণ্ট পাওয়া গেল (Projecting Phantoscope, Patent No. 536569 dated 26th March 1894)। এর কিছুদিন বাদে রোটারি লেন্স ক্যামেরারও পেটেণ্ট পাওয়া গেল (No. 560800)। প্রক্ষেপণ যন্ত্রের প্রস্তুতি পর্বে, জেনকিন্‌স ফটোগ্রাফিক টাইমসে (Photographic Times) এ নিয়ে আলোচনা করলেন। এর থেকে জানা গেল, কিনেটোস্কোপের মত ফিল্মের অবিরাম গতি অক্ষুণ্ণ রেখেই প্রক্ষেপণের প্রস্তাব ছিল এই যন্ত্রে।

পূর্ববর্তী অসুবিধাগুলোর কথা কেন এক্ষেত্রে চিন্তা করা হ'লনা এটা একটা আশ্চর্য্য ব্যাপার। কারণ এই পদ্ধতিতে আলোর অপব্যবহার হ'ত প্রচুর। একটা আর্কল্যাম্পের পূর্ণশক্তির মাত্র তিনশ ভাগের এক ভাগ কাজে লাগান যেত এই পদ্ধতিতে। পর্দায় প্রতিফলিত বিষয়বস্তুর সঠিক গতি আনার জন্য এবং একটি ছবির পরবর্তী ছবিকে সামঞ্জস্যে সূচিত করার জন্য নির্ধারিত ছিল প্রতি সেকেণ্ডের বারো হাজার ভাগের একভাগ সময়-সীমা। অর্থাৎ তখনকার প্রচেষ্টা অনুযায়ী প্রয়োজন ছিল প্রতি সেকেণ্ডে আটচল্লিশটা ছবির প্রক্ষেপণের। ব্যবহারিক দিক থেকেই এটা একটা প্রায় অসম্ভব প্রয়াস ছিল। তাই প্রস্তাবিত ফ্যাণ্টোস্কোপ নিজেকে ব্যবহার যোগ্য করে তুলতে সক্ষম হ'ল না। জেনকিন্‌স হতাশ হয়ে পড়লেও আরমাট কিন্তু হাল ছাড়লেন না। মাসের পর মাস পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাতে চালাতে আরমাট এক নতুন ধারণা পেলেন, যার মধ্যেই নিহীত রয়েছে প্রক্ষেপণের মূল সূত্র। আরমাট চিন্তা করলেন, ফিল্ম ক্রমাগত চলমান অবস্থায় না দেখিয়ে যদি সবিরাম (intermittent) দেখান যায়;

কিনেটোস্কোপের অভ্যন্তর
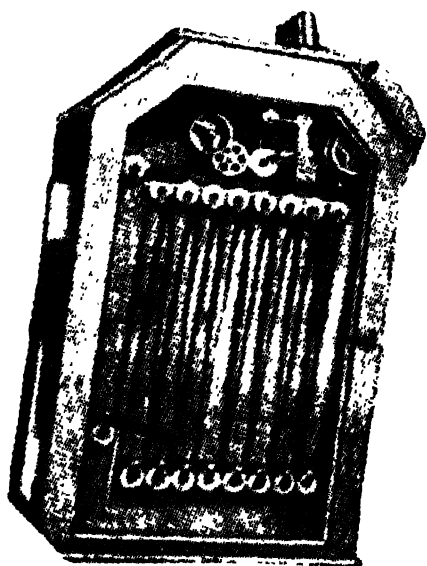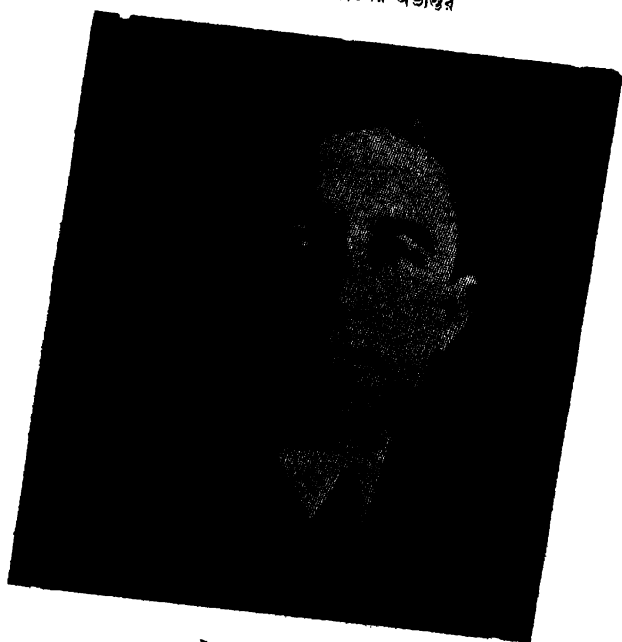
টমাস আরমাট
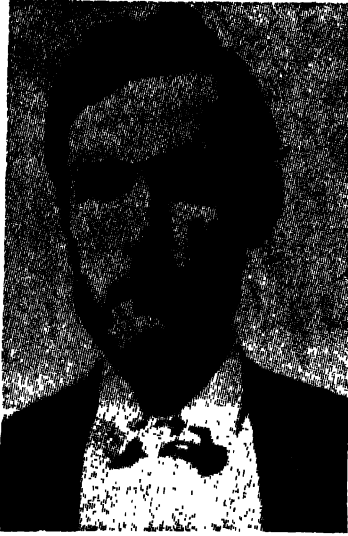
উইভিল ল্যাথাম

ফ্রান্সিস জেনকিনস্
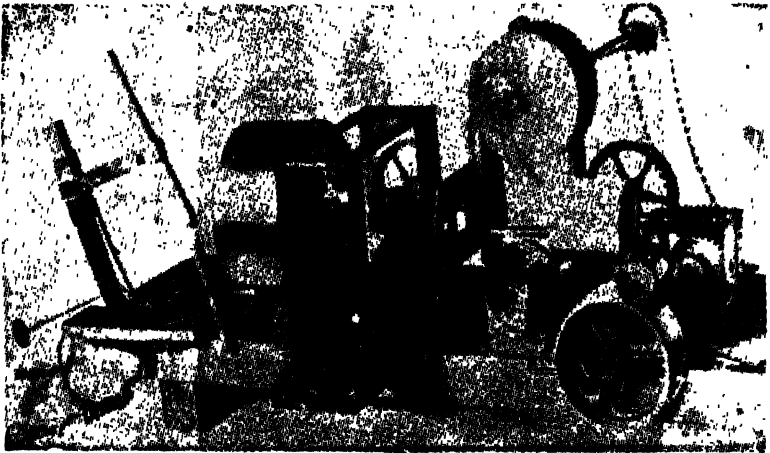
ফ্যান্টোস্কোপ

অর্থাৎ প্রত্যেক ছবি প্রতিফলিত অবস্থায় দীর্ঘকালীন স্থায়ীত্ব পাবে এবং পরবর্তী ছবিতে যাবার অন্তর্বর্তী সময়টা কম হবে।

চলচ্চিত্র গ্রহণের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি আসার কারণ আমরা আগেই দেখেছি। প্রক্ষেপণের ক্ষেত্রেও এই সামান্য কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারটা আরমাটের আবিষ্কারের অপেক্ষায় ছিল।

এই থামা ও দ্রুত চলার জন্য আরমাট একটা গিয়ার (Gear) লাগালেন তাঁর যন্ত্রে। ১৮৯৫ সালের অগাষ্ট মাসের মাঝামাঝি সময়ে Boston Gear Works থেকে তাঁর প্রয়োজনীয় যন্ত্রটি তিনি পেয়ে গেলেন। প্রচণ্ড উত্তেজনার মধ্যে রইলেন আরমাট। নতুন পদ্ধতির ফল কি হয় দেখার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে থাকলেন। সফল হ'ল তাঁর প্রচেষ্টা। ছবি প্রক্ষেপণ মোটামুটিভাবে উপস্থাপনযোগ্য হ'ল। সমকালীন অবস্থায় সবচেয়ে সুন্দর প্রক্ষেপণ ছিল আরমাটের। কিন্তু আওয়াজে কানে তালা লাগার উপক্রম হ'ল। তিন ইঞ্চি মোটা পিতলের গিয়ার একবার থেমে একবার চলে চেষ্টা করছিল প্রতি সেকেণ্ডে আটচল্লিশটা ছবিকে স্বচ্ছন্দ গতি দিতে। তার ফলে এক অসহনীয় আওয়াজের সৃষ্টি হ'ল এবং অল্পক্ষণ চলার পরেই গিয়ারটা কাজের অনুপযুক্ত হয়ে গেল। চলচ্চিত্র প্রক্ষেপণের কাজে ব্যবহৃত এই প্রথম গিয়ারটি চিরকাল দেখা গেছে আরমাটের টেবিলে পেপার ওয়েট হিসেবে। এই সমস্যারও একদিন সমাধান হ'ল। আরমাটের মনে পড়ল রোটারী লেন্স ক্যামেরা তৈরী করার সময় তাঁরা এক ধরনের লেন্স পরীক্ষার যন্ত্রের সাহায্য নেবার কথা ভেবেছিলেন। এতে ছিল এক বিশিষ্ট ধরনের যান্ত্রিক ব্যবস্থা যা একটা অবিরাম ঘূর্ণায়মান গিয়ার থেকে অপর একটি যন্ত্রকে সমানুপাতিক বা কম-বেশী গতি দিতে সক্ষম ছিল (Cam movement)। এটা তৈরী হয়েছিল ফ্রান্সে 'মারে' সংস্থায় (Marey Institute)।

যাই হোক, এই পদ্ধতি অনুসরণ করে নতুন নক্সা বানিয়ে, ছাঁচে ফেলে পিতলের যন্ত্র তৈরী করা হ'ল। অগাষ্ট মাসেই এই যন্ত্রের পরীক্ষায় প্রমাণ হ'ল, আগেকার যন্ত্রের সমস্ত দোষ ত্রুটি এতে অতিক্রম করা গেছে। এই 'ক্যাম' পদ্ধতি প্রায় নির্ভুলভাবে প্রক্ষেপণ যন্ত্রের লেন্সের সামনে দিয়ে ফিল্মকে দিল স্বচ্ছন্দ গতি আর সামান্য আওয়াজ।

আরমাট এর জন্য কোন পেটেণ্ট দাবী করলেন না। দুবছর আগে ১৮৯৩ সালে, মারে ইনস্টিটিউটের ডেমেনিকে (Georges Demeney : 1850-1917) ইংল্যাণ্ড থেকে এই পদ্ধতির পেটেণ্ট দেওয়া হয়ে গেছে (English Patent No. 24,457)।

এবার, সবার কাছে পেঁছে দেবার জন্য আরও দুখানা যন্ত্র তৈরী করা হ'ল। মোট তিনখানা যন্ত্র তৈরী হয়ে গেল ১৮৯৫ সালের অগাষ্ট মাসের মধ্যেই।

১৮৯৫ সালের অক্টোবর মাসে প্যারিসে কিনেটোস্কোপ দেখলেন লুই লুমিয়ের (Louis Lumiere : 1864-1948)। লুমিয়েরদের ছিল ফটোগ্রাফীরই ব্যবসা। তাঁদের জিনিষপত্রের যথেষ্ট কদর ছিল বাজারে। তখনকার দিনে নিউইয়র্কে ইস্টম্যান কোম্পানীর পরে তাঁদের কারখানাই ছিল সবচেয়ে বড়। লিয়ঁতে (Lyons) তাঁদের কারখানায় কাজ করত প্রায় তিনশ' লোক।

কিনেটোস্কোপ দেখা মাত্রই লুইয়ের মাথায় এল অন্য চিন্তা। চলচ্চিত্রকে পর্দায় আনার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন লুই। দাদা অগাষ্ট (Auguste Lumiere : 1862-1954) উদ্‌যোগী হলেন প্রক্ষেপণের সমস্যা সমাধানে। সমকালীন ইউরোপ বা অ্যামেরিকার বিভিন্ন জায়গায় যেভাবে কাজ এগুচ্ছিল, মোটামুটি সেভাবেই লুমিয়েরদের গবেষণা এগিয়ে চলল।

চলচ্চিত্রের উপযুক্ত ফিল্ম ইউরোপের বাজারে পাওয়া যাচ্ছিল না তখন। ইংল্যাণ্ড থেকে যেটুকু পাওয়া যাচ্ছিল সে ফিল্মের উৎকর্ষও কাম্য মানের ছিল না। যান্ত্রিক কুশলতায় বা রাসায়নিক ব্যাপারে লুমিয়েররা ছিলেন খুবই দক্ষ। তাই যখন তাঁরা অ্যামেরিকা থেকে (New York Celluloid Company) শুধু সেলুলয়েড আনতে সক্ষম হলেন, তখন তাঁদের কাজ এগিয়ে চ'লল দ্রুত গতিতে। ফাঁকা সেলুলয়েডের ফিতের ওপরে তারা নিজেদের কারখানায় আলোক সং-বেদনশীল রাসায়নিক দ্রব্য লাগিয়ে চলচ্চিত্রের উপযুক্ত ফিল্ম বানিয়ে ফেললেন।

লুমিয়েররাও প্রক্ষেপণের ক্ষেত্রে সবিরাম গতির প্রয়োজনীয়তার ব্যাপারে দ্রুত সিদ্ধান্তে আসতে পেরেছিলেন। প্রজেক্টার তৈরীর সাথে সাথে ক্যামেরা তৈরীর চেষ্টাও চলতে থাকল। ১৮৯৪ সালের শীতকাল থেকে '৯৫ সালের বসন্তকাল অবধি একটানা তাঁদের দুরূহ পরিশ্রম চ'লল। সেকেণ্ডে আটচল্লিশটা ছবি প্রক্ষেপণের ব্যাপারে তাঁরা আগ্রহী ছিলেন না। কারণ এতে ফিল্ম খরচ অনেক বেড়ে যেত। সেকেণ্ডে দশখানা ছবি চেষ্টা করে দেখা গেল গতি বিশেষ মন্থর হয়ে যাচ্ছে। এইভাবে ক্রমশ তাঁরা সেকেণ্ডে ষোল খানা ছবিতে প্রক্ষেপণের মাত্রা নির্দ্ধারণ করলেন। লুমিয়েরদের যন্ত্র হ'ল একাধারে ক্যামেরা এবং প্রজেক্টার। ক্যামেরার

গায়ে হাতলের মোচড়ে খাঁজকাটা দাঁতাল যন্ত্রাংশ একবারে টেনে নিতে পারত ছবির আটটা ফ্রেম। তাই সেকেণ্ডে দুবার হাতল ঘোরানোর প্রয়োজন ছিল। এডিসনের যন্ত্রের শক্তির উৎস ছিল বিদ্যুৎ আর লুমিয়েরদের যন্ত্র ছিল কায়িকশ্রমের উপর নির্ভরশীল। তাই, লুমি-য়েরদের যন্ত্র হ'ল অনেক সস্তা, ছোট এবং হাল্কা। 'ব্ল্যাক মারিয়ার' চার দেওয়ালের মধ্যেই এডিসনের কিনেটোস্কোপের যাবতীয় ছবি সীমাবদ্ধ ছিল। অপরপক্ষে লুমিয়েরদের ক্যামেরা প্রজেক্টার এক হাতে ঝুলিয়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়া যেত অনায়াসেই। চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে এ ব্যাপারটা কিন্তু যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। মূলতঃ লুইয়ের তত্ত্বাবধানে, মোয়াস' (Charles Moisson) নামে এক যন্ত্রশিল্পী এটা তৈরী করেছিলেন।

১৮৯৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে লুমিয়েররা তাঁদের যন্ত্র তৈরী করে ফেলতে সক্ষম হলেন। ১৩ই ফেব্রুয়ারী পেটেন্ট পাওয়া গেল। এই ক্যামেরা-প্রজেক্টারের নাম হ'ল 'সিনেমাটোগ্রাফ' (cinematographe), যে নাম ক্রমশ উচ্চারণের তফাৎ অনুসারে 'সিনেমা' বা কিনেমা নামে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ল। বাড়ীর বাগানে দাদা অগাস্ট, তাঁর স্ত্রী এবং বাচ্চাদের খাওয়ার দৃশ্যের ছবি তুললেন লুই। 'Le Repas de Bebe নামে এই ছবি প্রচণ্ড জনপ্রিয়তা পেয়েছিল। তাড়াতাড়ি সবাইকে তাঁদের আবিষ্কার দেখাবার হঠকারিতা লুমিয়েররা করলেন না। অল্প কয়েকজন লোকের সামনে তাঁদের লিয়ঁর কারখানায় ১৮৯৫'র ২২শে মার্চ প্রথম দেখান হ'ল তাঁদের ছবি। এর পর ১০ই জুন দেখলেন ফরাসী ফটোগ্রাফী সোসাইটি (Congres de l' Union Nationale des Societies Photographiques de France)।

লুমিয়েরদের ফিল্ম ছিল প্রায় কিনেটোস্কোপের ফিল্মের আকৃতির। শুধু ছবি পিছু চারখানা ছিদ্রের বদলে, লুমিয়েররা ব্যবহার করেছিলেন দুখানা ছিদ্র এবং কিনেটোস্কোপের ফিল্মের ছিদ্র যেখানে ছিল প্রায় আয়তক্ষেত্র, সিনেমাটোগ্রাফের সেক্ষেত্রে গোল।

প্রক্ষেপণের নিয়মানুসারে ফিল্মের গতি অবিরাম হলেও সিনেমাটো-গ্রাফে ছিল এক অর্ধগোলাকৃতি শাটার, যা ছবির স্থায়ীত্বের মাত্র অর্ধেক সময় আলোকিত করত পর্দায় প্রক্ষিপ্ত চিত্রকে। এর ফলে ছবিতে সামান্য কাঁপুনি লক্ষ করা যেত। তবু বলা যায় তদানিন্তন সময়ে লুমিয়েরদের

ছবি ছিল পর্দায় ফেলা ছবিগুলোর মধ্যে শ্রেষ্ঠ (মনে রাখতে হবে, আর-মাটের যন্ত্র তৈরী হতে তখনও মাস দুয়েক বাকী)। সিনেমাটোগ্রাফের ছবির দৈর্ঘ্য ছিল পঞ্চাশ ফুটের সামান্য বেশী। এপ্রিল মাসে তৈরী ল্যাথামদের যন্ত্রে যদিও বেশী দৈর্ঘ্যের ফিল্ম লাগান সম্ভব ছিল, তবু কিনেটোস্কোপের পদ্ধতি মত ফিল্মের গতি অবিরাম হওয়ায় প্রক্ষেপণ ছিল খুবই ত্রুটিপূর্ণ।

এই নানা ধরণের অবাঞ্ছিত যান্ত্রিক অসুবিধা, বা পরবর্তী কালে বিভিন্ন আইনগত ঝামেলা যা তখনই সহজে এড়িয়ে যাওয়া যেত, তা থেকে যাওয়ার একমাত্র কারণ হ'ল গবেষকরা পরস্পরের কাজ সম্পর্কে কোন খোঁজ খবর পেতেন না বা রাখতেনও না।

১২ই জুন প্রদর্শনীর পর সিনেমাটোগ্রাফ ফিরে গেল গবেষণাগারে আরও উন্নত হবার জন্য। বছরের প্রায় অধিকাংশ সময়টাই চলে গেল। ব্যবসায়িক ভাবে সিনেমাটোগ্রাফের প্রদর্শন শুরু হ'ল ২৮শে ডিসেম্বর ১৮৯৫ সালে গ্র্যাণ্ড কাফেতে (Salon Indien, Grand Cafe', Boulevard des Capucines)। জনসাধারণ এক ফ্রাঁয়ের (Franc) বিনিময়ে দেখতে পেলেন লুমিয়েরদের সিনেমাটোগ্রাফের ছবি। যে যে ছবি সেখানে দেখান হয়েছিল সেগুলো হ'ল—

1) La Sortie de l'usine LUMIERE a lyon.
2) La Voltige.
3) La peche aux Possions Rouges.
4) La Debarquement du Congres de photographie a Lyon.
5) Les Forgerons.
6) Les Jardinier.
7) Le Repas.
8) Le Sant a la Couverture.
9) La place des cordeliers a lyon.
10) La Mer.

প্রদর্শনী জমে উঠতে কয়েকদিন সময় লাগলেও, পরে ভীড় সামলানো সমস্যা হয়ে উঠেছিল। ব্যাপারটা বোধ হয় লুমিয়েররা আন্দাজ করতে পেরেছিলেন। যথেষ্ট যন্ত্র এবং দক্ষ কর্মী প্রস্তুত ছিল অবস্থা মোকাবিলা করার জন্য।

স্বদেশে বিপুল সাফল্যের পর সিনেমাটোগ্রাফ বেরিয়ে পড়ল দিগ্বিজয়ে। ১৮৯৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে দেখান হ'ল লণ্ডনে, এপ্রিলে ভিয়েনা এবং জেনেভায়, জুন মাসে মাদ্রিদ, বেলগ্রেদ এবং নিউইয়র্কে। নিউইয়র্কে সিনেমাটোগ্রাফ এত জনপ্রিয় হ'ল যে লোকের চাহিদার সাথে তাল দেওয়ার জন্য একুশ জন কর্মীর দলও যথেষ্ট ছিল না। জুলাই মাসে প্রদর্শনী হল সেণ্ট পিটার্সবার্গে এবং বুখারেস্টে। বছরের বাকী সময়টা সিনেমাটোগ্রাফ ঘুরে বেড়াল মিশর, ভারতবর্ষ, জাপান, অষ্ট্রেলিয়া ইত্যাদি দেশে। ভাষা এবং আচার ব্যবহারের বাধা জয় করে চলচ্চিত্র আপন সর্বজনীন ভাষায় পৃথিবীর বিস্তীর্ণ ব্যাপ্তিকে নিমেষে সংক্ষিপ্ত করে ফেলল।

সমাজের পটভূমিতে লুমিয়েরদের চলচ্চিত্রের এক বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল। লুমিয়েরদের প্রতিনিধিরা দূরদূরান্তরের দেশ থেকে চলচ্চিত্রের ব্যবসা করে শুধুমাত্র টাকা পয়সা নিয়েই ফিরে আসেন নি, বিভিন্ন দেশের, বিভিন্ন লোকাচারের ছবি তুলে এনে, এক দেশের মানুষকে অপর দেশ সম্পর্কে পরিচিত আর কৌতূহলী করে তুলতে সাহায্য করেছিলেন। সিনেমাটোগ্রাফ যেহেতু বৈদ্যুতিক শক্তি দ্বারা চালিত হ'ত না, তাই এক্ষেত্রে ব্যবস্থা ছিল এক ধরণের ইথারের (Ether) আলোর। ফলে যেখানে বিদ্যুৎ তখনও গিয়ে পৌঁছয়নি সে সমস্ত জায়গাতেও সিনেমাটোগ্রাফ প্রদর্শন সম্ভব ছিল। এর চেয়ে বড় কথা লুমিয়েরদের চলচ্চিত্রে মানুষ তার পরিবেশ পরিচয়ের গণ্ডী বিস্তীর্ণ করতে সক্ষম হ'ল। কারখানার শ্রমিকদের ছুটি হয়েছে; ট্রেন স্টেশনে ঢুকছে; শিশু খাবার খাচ্ছে ইত্যাদি দৈনন্দিন জীবনে বর্তমান বাস্তবতাকে পর্দায় দেখতে পাওয়া, মানুষকে দিল এক ভিন্ন ধরণের ভাললাগা। এর কয়েক বছর পরে অবশ্য লুমিয়েররা চলচ্চিত্র সম্পর্কে উদাসীন হয়ে পড়েন এবং ১৯০০ সালে, তাদের যন্ত্রের স্বত্ব পাথে কোম্পানীকে (Charles Pathe-এর সংস্থা) বিক্রি করে দেন।

দুই গ্রীক ব্যবসায়ীর হাত ধরে কিনেটোস্কোপ ইংল্যাণ্ডের মাটিতে পা দিয়েই রাতারাতি জনপ্রিয় হয়ে উঠল। এর প্রচন্ড চাহিদা দেখে এই দুই ব্যবসায়ী ঠিক করলেন, নিউইয়র্ক থেকে তিনশ' ডলার করে মেশিন আমদানি না করে ইংল্যান্ডেই এর নকল তৈরী করে ফেলা যায় কিনা এ ব্যাপারে খোঁজ নেবেন।

এইভাবেই তাঁদের সাথে আলাপ হ'ল বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির ব্যাপারে দক্ষ শিল্পী পলের সাথে (Robert W. Paul : 1869-1943)। গ্রীক ব্যবসায়ীদের প্রস্তাবে পল্ একটু ঘাবড়ে গেলেন। ব্যাপারটা বে-আইনী হবে মনে হ'ল। যাই হোক তখনই কথা না দিয়ে, এ ব্যাপারে খোঁজ খবর নিতে শুরু করলেন। এর থেকেই জানতে পারা গেল ইংল্যান্ডে কিনেটোস্কোপের কোন পেটেন্ট করা নেই। পল্ এবার উদ্যমী হলেন কিনেটোস্কোপ নকলের কাজে। ব্যবসায়ীদের প্রয়োজন মিটিয়ে নিজের জন্যও কয়েকটা মেশিন তৈরী করে ফেললেন। পলের যন্ত্রের প্রদর্শনী হ'ল লন্ডনের আর্লস্ কোর্টে (Earl's Court)।

পল্ আর তাঁর মেশিনের সুনাম চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল। ব্যবসাও জমে উঠতে দেরী হ'ল না। বিভিন্ন জায়গা থেকে অর্ডার আসতে থাকল এবং তার পরিমাণ মাঝে মাঝে এত বেশী ছিল যে যোগান দেওয়া একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়াল। সহকর্মীদের সাথে সকাল বেলা তাঁর কারখানায় (Hatton Garden-এ) আসার সময় পল্ দেখতেন ক্রেতারা আগের রাত্রি থেকে লাইন দিয়ে আছেন।

যাই হোক, পলের সমস্ত যন্ত্রের ব্যবহারিক প্রয়োগ কিন্তু নির্ভরশীল ছিল তখনকার সময়ে পৃথিবীর একমাত্র 'স্টুডিও 'ব্ল্যাক মারিয়া'তে তোলা ছবির ওপরে। রাতারাতি ইংল্যান্ডে ফিল্মের চাহিদা এত বেড়ে যাওয়ায় এডিসন কোম্পানীর ম্যানেজার গিলমোরের সন্দেহ হ'ল। খোঁজ খবরে সব প্রকাশ হওয়ার ফলে হঠাৎ ফিল্মের সরবরাহ বন্ধ হয়ে গেল। শুধু তাই নয়, গিলমোর দুজন এটর্নিকে (Frank Z. Maguire আর Joseph D. Baucus) পাঠালেন ব্যাপারটার হেস্তনেস্ত করতে।

কিন্তু আইনের চাপে, অত চালু ব্যবসা বন্ধ করে দেওয়ার কথা পল্ ভাবতেই পারছিলেন না। তাই অন্য একটা ব্যবস্থা নেওয়ার প্রয়োজন হ'ল। পল্ নিজেই ক্যামেরা তৈরীর চেষ্টা করতে থাকলেন। ক্যামেরা তৈরির কাজে হাত দিয়েই তিনি বুঝতে পারলেন সবিরাম গতির প্রয়োজনীয়তা। এই সময়ে একার (Birt Acres) নামে এক ফটোগ্রাফার এবং ফটোগ্রাফীর জিনিসপত্রের ব্যবসায়ী তাঁকে বিশেষ সাহায্য করলেন এ ব্যাপারে।

প্রকৃতপক্ষে রোল পেপার ফিল্মের ওপর ধারাবাহিক ছবি ছাপার এক যন্ত্রের নক্সা থেকেই পল্ ক্যামেরাতে সবিরাম গতি আনতে সক্ষম হয়েছিলেন। এই নক্সা ছিল একারের তৈরী। অবশ্য পল্, একারের নক্সার অনেক অদল বদল করেছিলেন। এই ব্যাপারে ১৮৯৫ সালের ২৯শে মার্চ একারের সাথে পলের একটা চুক্তিও হয়।

এডিসনের কিনেটোগ্রাফ ক্যামেরার চেয়ে পলের ক্যামেরা আকৃতিতে ছোট এবং সহজেই বহনযোগ্য ছিল। সেকেন্ডে কুড়িখানা ছবি গ্রহনের উপযুক্ত করে তৈরী করা হয়েছিল এই ক্যামেরা। এই পরিমাপই তাঁর মনে হয়েছিল চলচ্চিত্রের পক্ষে প্রয়োজনীয় স্বাভাবিক গতি রাখতে সক্ষম। ফিল্ম খরচের দিক থেকেও কিনেটোগ্রাফের প্রায় অর্ধেক ছিল এই ক্যামেরা।

ইংল্যাণ্ডের কিনেটোস্কোপের জন্য এই ক্যামেরায় তোলা হ'ল, Boot Black at work in a London Street, A Rough Sea at Dover ইত্যাদি ছবি। ক্রমশ পল্ও ক্রেতাদের চাহিদা এবং একসাথে অনেক লোককে দেখানর সুযোগ, এইসব কথা চিন্তা করে, চলচ্চিত্র প্রক্ষেপণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন।

ল্যাথাম, আরমাট ইত্যাদি গবেষকদের মতই পল্ ক্রমান্বয়ে পার হয়ে এলেন বিভিন্ন অসুবিধা। প্রথমে, কিনেটোস্কোপের মত ফিল্মের অবিরাম গতি নিয়ে প্রক্ষেপণের চেষ্টা করলেন। ১৮৯৫ সালের অক্টোবর মাস নাগাদ তিনি বুঝতে পারলেন ক্যামেরার ক্ষেত্রে যেমন তিনি সবিরাম গতি ব্যবহার করেছেন, প্রক্ষেপণের ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার প্রয়োজনীয় '···Early in 1895 I had not realized the necessity for intermittent movement of the film, but it is certain that I did so by October of that year ; this of course refers to projection, and

is the stranger as I had already made several cameras with intermittent motion......'

১৮৯৫ সালে এই সমস্ত কাজের জন্য প্রয়োজনীয় ফিল্ম পল্ পেলেন ব্লেয়ার কোম্পানীর কাছ থেকে (Blair Concern, Foots Gay, Kent)। এই সংস্থা অ্যামেরিকা থেকে আমদানী করা সেলুলয়েডের ওপর ফটোগ্রাফীর জন্য উপযুক্ত রাসায়নিক পদার্থ লাগিয়ে বাজারে ছাড়ত। ক্যামেরার জন্য সবিরাম গতি প্রয়োগের কারিগরী জ্ঞান প্রয়োগ করে পল্ একদিন প্রক্ষেপণের ক্ষেত্রেও সফল হলেন।

১৮৯৪ সালে প্রকাশিত হয়েছিল ওয়েল্সের (H. G. Wells) লেখা 'The Time Machine'। টাইম মেশিনের বৈজ্ঞানিক নায়ক তার তৈরী করা যন্ত্রে সময়ের অনাদি-অনন্তস্রোতে, অতীত থেকে বর্তমান, বর্তমান থেকে ভবিষ্যতে ভ্রমণের লোমহর্ষক কাহিনী পল্‌কে ভীষণ প্রভাবিত করল। এর চলচ্চিত্রীক উপাদান, পলকে এতখানি উৎসাহিত করল যে তিনি লেখকের সাথে বিস্তারিত আলোচনা করলেন কিভাবে উপন্যাসটাকে চলচ্চিত্রের উপযোগী করে সাজিয়ে নেওয়া যায়। এর বিস্তারিত বিবরণ এবং খুঁটি-নাটি দিক লিপিবদ্ধ করে তিনি পেটেন্টের জন্য আবেদনও করেছিলেন (Patent application No. 19984 dated October 24, 1895)।

যদিও সে ছবি আর্থিক অপ্রাচুর্য্য এবং আনুষঙ্গিক বিভিন্ন কারণে করে ওঠা সম্ভব হয়নি, তবু স্থান, কাল বিচার করলে অর্থাৎ চলচ্চিত্রের যান্ত্রিক অবস্থা, বিষয়বস্তু ইত্যাদির কথা ভাবলে, চলচ্চিত্রকে শুধুমাত্র চিত্তবিনোদনের মাধ্যম হিসেবে নয়, পরিপূর্ণ শিল্প মাধ্যম হিসেবে পরিগণিত করার জন্য পলের এই অসাধারণ প্রয়াস, আজ আমাদের বিস্মিত এবং শ্রদ্ধাবনত করে তোলে।

১৮৯৬ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারী Finsbury Technological College-এ দেখান হ'ল পলের যন্ত্র। উপযুক্ত সম্মান পেলেন পল্। ইংল্যান্ডে তৈরী প্রথম চলচ্চিত্র প্রক্ষেপণ যন্ত্রের নাম হ'ল 'থিয়েট্রোগ্রাফ' (Theatrograph)।

১৮৯৫ সালের গ্রীষ্মের শুরুতে ল্যাথামদের সফল প্রচেষ্টা স্বাভাবিক ভাবেই তাঁদের মধ্যে যথেষ্ট উদ্দীপনার সঞ্চার করেছিল। কিন্তু চলচ্চিত্রের প্রয়োগবিদ্যার যে সমস্ত চাঞ্চল্যকর উন্নতি ঘটছিল, সে ব্যাপারে তাঁদের খোঁজ খবর নেওয়ার মত যথেষ্ট উৎসাহের অভাব ছিল। ল্যাথাম ভ্রাতৃদ্বয়ের মেজাজী চালচলন এবং উন্নাসিকতা তাঁদের ব্যবসায়ীক কাজকর্মকে বিশেষ সাহায্য করছিল না।

ইতিমধ্যে তাঁদের প্যান্টোপ্‌টিকন্‌ যন্ত্রে সংযোজিত হয়েছে বৈদ্যুতিক আর্কল্যাম্প এবং নতুন নাম রাখা হয়েছে 'আইডোলোস্কোপ' (Eidoloscope)। নতুন যন্ত্র জুন মাসের শেষদিকে প্রস্তুত হয়ে গেল সর্বসাধারণের সামনে যাবার জন্য। এই সময়ে প্রফেসর ল্যাথামের এক ভাইপো, লেরয়ের (LeRoy Latham) চলচ্চিত্র ব্যবসায় নেমে পড়ার ইচ্ছা হ'ল। তিনি বেকার অবস্থায় দিন অতিবাহিত করছিলেন চাকরী যাবার পর। যাই হোক, ল্যাথামদের বাসভূমি ভার্জিনিয়া প্রদেশে প্রদর্শনীর অধিকার তিনি পেলেন লাম্‌ডা কোম্পানীর কাছ থেকে তিন হাজার ডলারের বিনিময়ে। চলচ্চিত্রের ইতিহাসে এটাই প্রথম প্রাদেশিক স্বত্ব বিক্রির ঘটনা। ভার্জিনিয়ার নর্‌ফোকে (Norfolk) প্রথম প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হ'ল। এ ব্যাপারে তাঁকে সাহায্য করলেন তাঁর বন্ধু লিন্‌ডারম্যান (Henry C. Linderman)। একটা গুদামঘর ভাড়া নেওয়া হ'ল। সেখানে রইল দেড়শ' খানা চেয়ারের ব্যবস্থা। সাদা পর্দাও টাঙিয়ে দেওয়া হ'ল ; এবার তাঁরা অপেক্ষা করতে থাকলেন ছবি আসার জন্য। লাম্‌ডা কোম্পানীর প্রযোজক-পরিচালক অট্‌ওয়ে ছবি তৈরীর ক্ষেত্রে বিস্তর অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছিলেন। এডিসনের কিনেটোস্কোপের উপযুক্ত ফিল্ম তাঁদের যন্ত্রে লাগান যেত না, এছাড়া এডিসন দিতেই রাজী হতেন না। এই রকম অবস্থার মধ্যে আবার কোম্পানীর ভেতরে গণ্ডগোল শুরু হয়ে গেল। বিভিন্ন ব্যাপারে আগে থেকেই ডিকসনের সাথে ল্যাথাম ভাইদের মতানৈক্য হচ্ছিল এছাড়া ডিকসন এই সংস্থার বাণিজ্যিক ভবিষ্যতের ওপরে আস্থা

রাখতে পারছিলেন না। তাই, এবার তিনি লামডা কোম্পানী থেকে মুক্তি চাইলেন এবং একদিন, লামডা কোম্পানীতে তাঁর বিনিয়োজিত কুড়ি হাজার ডলার তুলে নিয়ে চলে গেলেন।

অট্ওয়ে কিন্তু নিরুৎসাহ হলেন না। ম্যাডিসন স্কয়ার গার্ডেনের ছাদে তৈরী করে ফেললেন পাঁচখানা ছবি। পঞ্চাশ থেকে একশ ফুট দৈর্ঘ্য ছিল এই ছবিগুলোর। সেখানে তৈরী হ'ল নিকলাস বোনেদের (Nicholas sisters) 'Split Dance', গ্রিফো বার্ণেটের (Griffo. Vs. Barnett) মুষ্টি যুদ্ধ, রস্ এবং রোয়েবারের (Duncan C. Ross Vs. Ernest Roeber) মল্লযুদ্ধ, নিউইয়র্ক শহরের দৃশ্য 'The side walks of New York' এবং 'The waves'।

নর্ফোকের গুদাম ঘরে চেয়ার পিছু পঁচিশ সেণ্টের বিনিময়ে, অগাষ্ট মাসে শুরু হ'ল পৃথিবীর প্রথম বাণিজ্যিক ভিত্তিতে চলচ্চিত্রের প্রদর্শনী।

১৮৯৫ সালের গ্রীষ্মের শেষদিকে আরমাট-জেনকিন্স সিদ্ধান্ত নিলেন ফ্যাণ্টোস্কোপকে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে ব্যবহার করার। এ ব্যাপারে দুজনের মধ্যে একটা চুক্তি হ'ল। আটলাণ্টায় কটন্ স্টেট্স (Cotton States Exposition) মেলায় দেখান হবে ফ্যাণ্টোস্কোপের ছবি।

আটলাণ্টার বিরাট মেলায়, নতুন যন্ত্রকে জনসাধারণের সাথে পরিচয় করিয়ে দেবার জন্য সত্যই উপযুক্ত স্থান ছিল। সেপ্টেম্বর মাসের মাঝামাঝি সময়ে শুরু হ'ল এই মেলা। আরমাটদের প্রদর্শনীর অল্প কিছু দূরে গ্রে ল্যাথামও উপস্থিত ছিলেন তাঁর আইডোলোস্কোপ নিয়ে। আর ছিলেন কিনেটোস্কোপ নিয়ে র‍্যাফ আর গ্যামন। তাঁরা প্রদর্শনীর জন্য ব্যয় করেছিলেন প্রায় আট হাজার ডলার। কিন্তু মানুষ তখন আর ফুটোয় চোখ লাগিয়ে ছবি দেখতে চাইছিল না। একসাথে অনেক লোক এক জায়গায় বসে, অনেক আরামে প্রমাণ মাপের ছবি দেখার সুযোগ পাচ্ছিল পাশাপাশি অন্য প্রদর্শনী থেকে। তবে অন্য ছবিও যে দেখতে চাইছিল এমন কথাও বিশেষ জোর দিয়ে বলা যায়না। আরমাটের প্রদর্শনী মণ্ডপের বাইরে এক-জন লোক রাখতে হয়েছিল যে, চিৎকার করে ঘোষণা করছিল, যে কোন লোক ছবি দেখতে ঢুকতে পারেন, ছবি দেখে ভাল লাগলে তবেই পয়সা দেবেন ইত্যাদি। তাই, কিনেটোস্কোপের অবস্থা হ'ল সবচেয়ে শোচনীয়। প্রচুর টাকা লোকসান হ'ল র‍্যাফ আর গ্যামনের।

আরমাটদের প্রদর্শনীর সমস্ত ছবিই ছিল কিনেটোস্কোপের জন্য তৈরী ছবির প্রিন্ট। আর কলম্বিয়া ফনোগ্রাফ পার্লারের (Columbia Phonograph Parlor-Washington) মালিক মার্ফির (E. F. Murphy) মাধ্যমে পাওয়া গিয়েছিল অ্যানাবেলের নাচের রঙিন ছবি।

আরমাট-জেনকিন্সের প্রদর্শনী, আটলান্টার মেলায় বিশেষ সফল হ'ল না। ইতিমধ্যে ভাইয়ের বিয়ে উপলক্ষ্যে জেনকিন্স তাঁর বাড়ী চলে গেলেন, (Richmond, Indiana) সাথে নিয়ে গেলেন একটা প্রজেক্টার আর কিছু ফিল্ম, বন্ধু-বান্ধবদের দেখাবার জন্য।

এদিকে আরমাট প্রদর্শনীর সময়ে প্রজেক্টারের যে সমস্ত ত্রুটিগুলো লক্ষ্য করেছিলেন, সেগুলো মুক্ত করার চেষ্টা করতে থাকলেন। প্রজেক্টারের সবিরাম গতি অর্থাৎ একবার চলা আবার থামা, পুনরায় চলা ইত্যাদির ফলে যে কম্পন সৃষ্টি হচ্ছিল তার ফলে ফিল্ম খুব তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল। বহু চিন্তা এবং প্রচেষ্টার পর আরমাট ঠিক রেকটরের মতই, ফিল্ম সরবরাহের রীলের কাছে চার-পাঁচ ইঞ্চি আল্‌গা ফিল্মের ফাঁস তৈরী করলেন যাতে ঝাঁকুনিটা পুরো রীলে না লাগে। রেকটর প্রথম এই ল্যাথাম লুপের পদ্ধতি ব্যবহার করেছিলেন ক্যামেরার ক্ষেত্রে আর আরমাট করলেন প্রজেক্টারের ক্ষেত্রে।

রীচমণ্ডে, জেনকিন্সের বাসভূমিতে কিন্তু একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটল। ২৯শে অক্টোবর, মঙ্গলবার, ১৮৯৫ সালে জেনকিন্সের ভাইএর গয়নার দোকানে কিছু লোকের সামনে ফ্যান্টোস্কোপের এক প্রদর্শনী হ'ল। পরের দিন খবরের কাগজে (Richmond Telegram) এর ভূয়সী প্রশংসা ছাপা হ'ল আর আবিষ্কর্তা হিসেবে নাম করা হ'ল শুধু মাত্র জেনকিন্সের। রীচমণ্ডের এই প্রদর্শনীই সূত্রপাত করল দুজনের বিচ্ছেদের। রীচমণ্ড টেলিগ্রামের এক কপি আরমাটের কাছে পাঠিয়ে দিলেন মার্‌ফি।

নভেম্বর মাসের শুরুতে আরমাট, আটলান্টা থেকে ফিরে এলেন ওয়াশিংটনে। সাথে নিয়ে এলেন দুখানা ফ্যান্টোস্কোপ। ইতিমধ্যে ফ্যান্টো-স্কোপের যান্ত্রিক অবস্থার অনেক অদলবদল তিনি করেছেন, আগের চেয়ে অনেক বেশী উন্নত হয়ে গেছে তাঁর যন্ত্র।

জেনকিন্‌স একদিন ফিরে এলেন তাঁর ওয়াশিংটনের ভাড়া বাড়ীতে (B17, East Capitol Street)। আরমাট গিয়ে দেখা করলেন তাঁর সাথে। জেনকিন্‌স জানালেন তিনি আর আরমাটের সাথে কাজ করতে চান না। তিনি একাই কাজ চালাতে পারবেন।

এই ঘটনার পরের দিনই জেনকিন্‌স এক প্রজেক্টারের জন্য পেটেন্ট আবেদন করলেন (25th November 1895) নিজের নামে। যন্ত্রের বিবরণ পুরো মিলে যায় আরমাট-জেনকিন্‌স যুগ্ম প্রচেষ্টায় তৈরী যন্ত্রের সাথে। স্বাভাবিকভাবেই জেনকিন্‌সের প্রস্তাব আরমাট-জেনকিন্‌সের চুক্তিকে লঙ্ঘন করে গেল।

পেটেন্ট অফিসে মামলার শুনানীর দিন ধার্য হবার আগেই জেনকিন্‌স অন্য জায়গাতেও চেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকলেন যন্ত্রের একমাত্র আবিষ্কারক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য। ১৮ই ডিসেম্বর, ১৮৯৫ সালে ফিলাডেলফিয়ায় ফ্রাঙ্কলীন ইন্‌স্টিটিউটে বক্তৃতা সহকারে যন্ত্রের প্রদর্শনীও করলেন। এখানকার সদস্য ছিলেন কারবাট্‌, যিনি আবার জেনকিন্‌সের ব্যক্তিগত বন্ধুও ছিলেন। কারবাটের ছিল ফিল্ম তৈরির ব্যবসা। তাঁর কারখানায় (Keystone Co.) তৈরি ফিল্ম তিনি এডিসনকে দিয়েছিলেন নমুনা হিসেবে ১৮৮৮ সালে এবং ইস্টম্যান কোম্পানীর একজন প্রতিযোগী হিসেবে নিজের ব্যবসাকে দাঁড় করাতে চাইছিলেন। তিনি ব্যবসায়ীক কারণে আরমাটের ওপর মোটেই সন্তুষ্ট ছিলেন না, কারণ আরমাট, কারবাটের ফিল্ম তাঁর নিজের কাজের অযোগ্য বলে বাতিল করে দিয়েছিলেন। তাই যখন, ১৮৯৬ সালের নভেম্বর মাসে পেটেন্ট অফিসে, জেনকিন্‌সের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হয় (Patent Office interference Case No. 18,032) এবং সেই মামলার রায় আরমাটের স্বপক্ষে অর্থাৎ ফ্যান্টোস্কোপের আবিষ্কর্তা আরমাট-জেনকিন্‌স এটাই আইন মেনে নেয় এবং নতুন পেটেন্টও ওই নামে দেওয়া হয় (Patent No. 586953 dtd. July 20, 1897), তখনও ফ্রাঙ্কলীন ইন্‌স্টিটিউটের কর্তারা ব্যাপার-টাকে মেনে নিতে পারলেন না। আরমাট ইন্‌স্টিটিউটের কাছে শুধুমাত্র প্রতিবাদই জানাননি তিনি প্রমাণ-পত্র দাখিল করতে চেয়েছিলেন। সব কিছু উপেক্ষা করেই ফ্যান্টোস্কোপ আবিষ্কারের সম্মান নিদর্শন মেডেল (Elliot cresson medal) জেনকিন্‌সকে দেওয়া হ'ল। স্মিথ্‌সোনিয়ান

মিউজিয়ামে (National Museum of the Smithsonian Institution, Washington) সংরক্ষিত হ'ল ফ্যান্টোস্কোপ ; আবিষ্কর্তা অবশ্যই সি. ফ্রান্সিস জেনকিন্‌স ।

এতসব ঝামেলার মধ্যেও আরমাটের গবেষণায় কিন্তু ভাঁটা পড়েনি । ভাই-এর সাইকেলে অতিক্রান্ত দূরত্ব মাপার যন্ত্রের (odometer) কার্যাবলী লক্ষ্য করে, জেনেভা ক্রসের মত এক পদ্ধতি উদ্ভাবন করলেন যা তাঁর প্রজেক্টারের ফিল্মকে দিল আরও স্বচ্ছন্দ সবিরাম গতি ; যা আজকের দিনের প্রজেক্টারের মধ্যেও লক্ষ্য করা যাবে ।

মারভিন (H. N. Marvin) নামে এক ভদ্রলোকের সাথে ডিকসনের আলাপ ছিল সেই ওয়েষ্ট অরেঞ্জ ল্যাবরেটরি থেকেই। মারভিন ছিলেন বিজ্ঞানের প্রতি আকৃষ্ট সহজাত ভাবেই। বৈদ্যুতিক শক্তি পরিচালিত ছিদ্র করার যন্ত্র (drill machine) আবিষ্কারক হিসেবে তিনি এডিসনের গবেষণাগারের সাথে পরিচিত ছিলেন।

ক্যাসলার (Herman Casler) নামে আরেক ভদ্রলোক; ইনিও এডিসনের ইলেকট্রিক কোম্পানীর (Edison General Electric Company) যন্ত্র শিল্পী ছিলেন, তখন মারভিনের সাথে ব্যবসা করছিলেন (Marvin & Casler Company, Canastota) বিভিন্ন ধরণের যন্ত্রপাতির।

এই সময়ে ডিকসন, এক ধরণের যন্ত্রের পরিকল্পনা করলেন যাতে হাতে আঁকা ছবি ক্রমান্বয়িক পর্যায়ে দেখা যাবে (animated pictures)। যন্ত্রটা হবে কিনেটোস্কোপের মত ফুটোয় চোখ লাগিয়ে দেখবার যন্ত্র; কিন্তু এক্ষেত্রে দামী ব্যাটারী বা ফিল্মের প্রচুর খরচা বাদ দেওয়া যাবে।

মারভিন এই ব্যাপারে কথা বললেন তাঁর বন্ধু কুপম্যানের (E. B. Koopman) সাথে। কুপম্যানের ছিল মজার মজার খেলনা যন্ত্রপাতি ইত্যাদির ব্যবসা (Magic Introduction Company, Broadway, N.Y.)। সব শুনে কুপম্যানও রাজী হয়ে গেলেন নতুন যন্ত্র তৈরী ব্যবসায় টাকা বিনিয়োগ করতে। এই ভাবেই তৈরী হ'ল 'K. M. C. D. Syndicate' উদ্যোক্তাদের নামের আদ্যক্ষর নিয়ে (Koopman, Marvin, Casler, Dickson)। ডিকসনও, ল্যাথামদের কাছ থেকে চলে আসার পর তাঁর সমস্ত টাকা নতুন ব্যবসায়ে লাগালেন। ডিকসনদের যন্ত্র তৈরী হয়ে যাওয়ার পর, বিভিন্ন ছবি নিয়ে এতে পরীক্ষা করতে করতে একদিন তাঁরা কিনেটোস্কোপের এক ফালি ছবি তাঁদের যন্ত্রে লাগিয়ে দেখলেন, অন্য

ছবিগুলোর চেয়ে এই ছবি অনেক সুন্দর লাগছে। তাই মারভিন চেষ্টা করলেন যাতে এডিসন কোম্পানীর সাথে একটা ফিল্ম সরবরাহের চুক্তি করা যায়। ব্যাপারটা বাস্তবিকই খুব দুঃসাহসের কাজ ছিল। এডিসনের কাছে প্রস্তাবটা পেঁছিন মাত্রই তিনি সরাসরি নাকচ করে দিলেন।

K. M. C. D. Syndicate-এর প্রয়োজনীয় ফিল্ম সরবরাহ সুস্থির না হওয়ার ফলে. ফিল্ম তৈরীর কাজে তাঁদের বাধ্য হয়েই নামতে হ'ল। এডিসনের পেটেন্ট লঙ্ঘন করে না এমন একটা ক্যামেরা তৈরী করার দায়িত্ব পড়ল ক্যাসলারের ওপর। ডিকসন তাঁর পূর্ণ কারিগরী জ্ঞান নিয়ে পাশে রইলেন। তাঁর পক্ষে সরাসরি ক্যামেরা তৈরীর কাজে নেমে পড়ায় আইনগত কিছু অসুবিধা দেখা দিতে পারে, এই ভেবে তিনি নিজেকে খাতায় কলমে এ ব্যাপারে জড়ালেন না।

একদিন ক্যাসলারের ক্যামেরা তৈরীর কাজ শেষ হ'ল। এডিসনের ফিল্মের আয়তনের প্রায় আটগুণ বেশী আয়তনের ফিল্ম ব্যবহার করা হ'ল (২$\frac{৩}{৪}$" × ২")। সেকেন্ডে তিরিশ খানা ছবি নিতে সক্ষম ছিল ক্যামেরা। ফলে এডিসনের ক্যামেরার প্রায় চৌদ্দগুণ বেশী খরচ পড়ত ফিল্মের। এছাড়া ফিল্মের গায়ে ছিদ্রের ব্যবহারটাও ছিল অদ্ভুত ধরণের। কোন ছিদ্র ছাড়াই ফিল্মের ফালি ক্যামেরায় পরিয়ে নেওয়া হ'ত। প্রত্যেকটি ছবি নেওয়ার মুহূর্তেই ছবির (frame) ওপরে এবং নীচে, মাঝখান বরাবর দুটো ফুটো হয়ে যেত। ছবিগুলো পরপর সমান ব্যবধানেও থাকত না। এই রকম নানা দিক দিয়ে, ক্যাসলারের ক্যামেরা এডিসনের পেটেন্ট-কে সম্পূর্ণ এড়িয়ে গেল।

K. M. C. D. Syndicate-এর চোখ লাগিয়ে দেখার যন্ত্র মিউটো-স্কোপের (Mutoscope) জন্য তৈরী ক্যাসলারের ক্যামেরার নাম হ'ল মিউটোস্কোপ ক্যামেরা। তৎকালীন সবচেয়ে জনপ্রিয় বিষয়বস্তু মুষ্টি যুদ্ধের ছবিও তোলা হ'ল ক্যাসলারের বাড়ীর প্রাঙ্গনে। এরপর এই ক্যামেরার সামনে এলেন নাট্য জগতের বিখ্যাত অভিনেতা জেফারসন্ (Joseph Jefferson), তাঁর মঞ্চসফল রীপভ্যানের চরিত্রাভিনয়ের কিছু কিছু দৃশ্য তোলা হ'ল মিউটোস্কোপের জন্য (Rip's Awakening, Rip's Toast ইত্যাদি)।
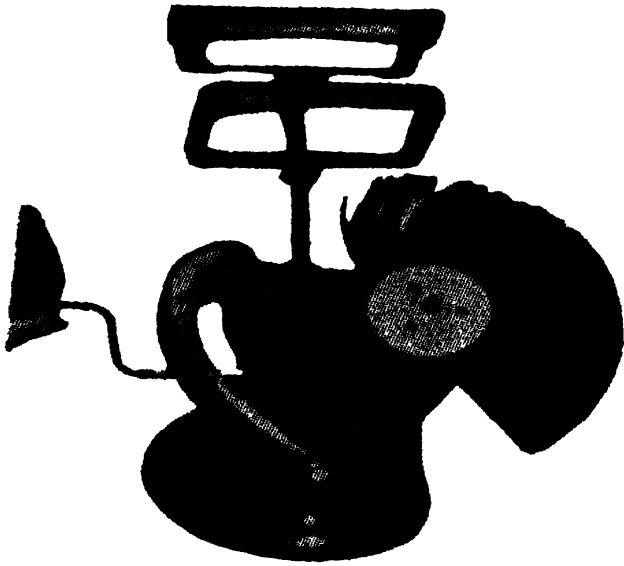
মিউটোস্কোপ
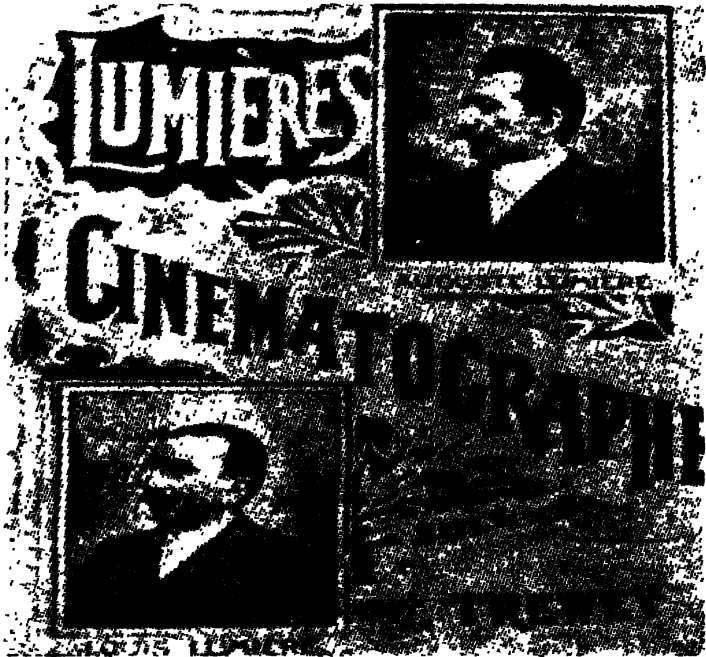
লুই-অগাস্ট লুমিয়েরের
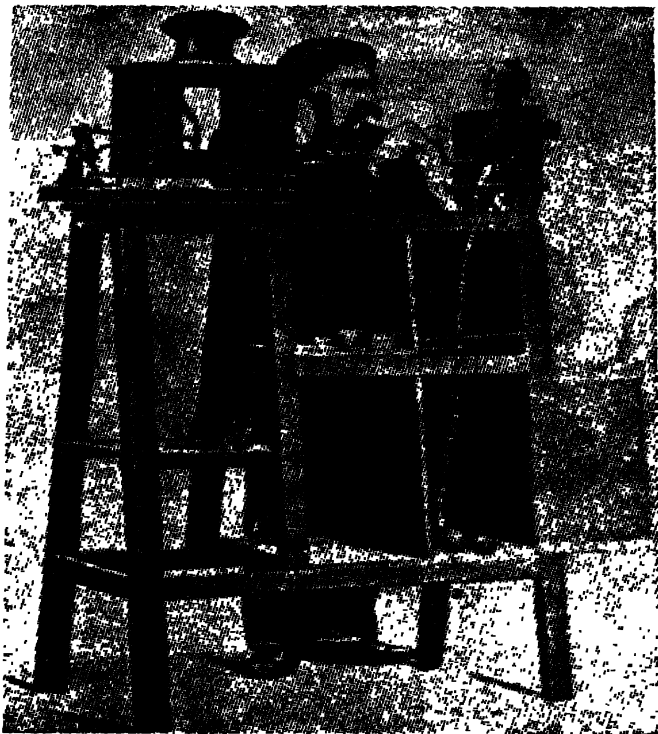
সিনেমাটোগ্রাফ যন্ত্র

রবার্ট পল

K. M. C. D.'র পক্ষে কুপম্যান, অ্যামেরিকান মিউটোস্কোপ কোম্পানীর (American Mutoscope Company) নতুন যন্ত্র, ১৮৯৫ সালের শীতকাল নাগাদ বাজারে ছাড়লেন। কিনেটোস্কোপকে পেছনে ফেলে রাতারাতি জনপ্রিয়তার শীর্ষে চলে গেল মিউটোস্কোপ।

এই সাফল্যই তাঁদের প্রেরণা যোগাল আরও বড় কিছু করার, অর্থাৎ ছবি প্রক্ষেপণ ব্যবস্থার। যে যে সম্ভাব্য যান্ত্রিক অসুবিধা হতে পারত, তা তাঁরা ক্যামেরা তৈরীর সময়েই পার হয়ে আসতে পেরেছিলেন। তাই প্রক্ষেপণ যন্ত্রও একদিন তৈরী হয়ে গেল, আর এর থেকেই জন্ম হ'ল American Mutoscope & Biograph Company-র। নতুন প্রক্ষেপণ যন্ত্র অচিরেই আত্মপ্রকাশ করল 'বায়োগ্রাফ' (Biograph) নাম নিয়ে এবং লুমিয়ের, পল্, আরমাট, ল্যাথামদের সাথে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হল।

সস্তা এবং উন্নত যন্ত্র মিউটোস্কোপ বাজারে আসার পর থেকেই কিনেটোস্কোপের চাহিদা ভীষণভাবে কমে গেল। কিনেটোস্কোপের দাম অনেক কমিয়ে দিয়েও তা রোধ করা গেল না। ইতিমধ্যে এডিসনের কর্মী কেইসার, রাফ-গ্যামনদের অফিসে প্রক্ষেপণের যে প্রচেষ্টা চালাচ্ছিলেন তারও কোন ফলপ্রসূ প্রতিশ্রুতি পাওয়া যায়নি তখনও। এই অবস্থার মধ্যে পড়ে র‍্যাফ কিনেটোস্কোপ কোম্পানী তুলে দেবার কথা ভাবছিলেন। এই সময়ে, আরমাট তাঁদের সাথে যোগাযোগ করে জানালেন, তিনি নিখুঁত প্রজেক্টার দিতে পারেন। র‍্যাফ-গ্যমন কেউই ঠিক বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। আরমাট তাই তাঁদের সন্দেহ কাটাবার জন্য ওয়াশিংটনে আসার আমন্ত্রণ জানালেন সমস্ত খরচ তিনিই দেবেন এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে।

১৮৯৫ সালের ৮ই ডিসেম্বর গ্যামন এলেন ওয়াশিংটনে আরমাটের অফিসে। দেওয়ালে প্রক্ষিপ্ত অ্যানাবেলের পরিষ্কার স্বচ্ছন্দ ছবি দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলেন গ্যামন। ছবি দেখে ফিরে গেলেন তিনি, এবং যাবার আগে আরমাটকে অন্য কোন সংস্থার সাথে চুক্তি না করার জন্য অনুরোধ করে গেলেন।

এবারের সমস্যা হ'ল কিভাবে এটাকে বৃহদায়তনে প্রস্তুত করা যায়। কপাল ঠুকে গ্যামন চেষ্টা করলেন এডিসনের কোম্পানীতে ব্যবস্থা করার। ম্যানেজার গিলমোর, এ ব্যাপারে কেবলই এডিসনের স্বার্থের প্রশ্ন তুলে জট পাকাতে থাকলেন। এইভাবে একমাস কেটে গেল গ্যামনের ওয়াশিংটনে ঘুরে আসার পর। যা করার তখনই করে ফেলার দরকার ছিল। বহু আলোচনার পর, ১৫ই জানুয়ারী ১৮৯৬, গ্যামন আর-মাটকে টেলিগ্রাম করে পাকা কথা জানালেন।

আরমাট ইতিমধ্যে তাঁর যন্ত্রকে আরও উপযুক্ত করে রাখলেন, যাতে এডিসনের কর্মীদের নকল তৈরী করতে কোন অসুবিধা না হয়।

বিভিন্ন কারণে বিলম্বিত হবার পর ১৮৯৬ সালের ৯ই মার্চ, র‍্যাফ-গ্যামনদের নতুন অফিসে (43, West 28th Street) ক্রেতাদের দেখানর

জন্য একটা প্রচার সংস্করণ রাখা হ'ল। রেইসার্ (A. F. Reiser) ছিলেন প্রথম ক্রেতা। তিনি প্রত্যেক মেশিনের জন্য বছরে তিনশ' ডলারের বিনিময়ে ইজারা (lease) নিতে চুক্তিবদ্ধ হলেন পেনসিল-ভ্যানিয়া প্রদেশের জন্য। নতুন যন্ত্রের নাম দেওয়া হ'ল 'ভিটাস্কোপ' (Vitascope)।

ভিটাস্কোপ বাজারে ছাড়ার ব্যাপারে র‍্যাফ-গ্যামনরা এক অদ্ভুত ব্যবসায়ীক কৌশল গ্রহণ করলেন। তাঁরা জানতেন, বেশ কিছু ক্রেতা আছেন যারা শুধুমাত্র এডিসনের নামের ওপরেই নির্ভর করে থাকেন। অন্যের যত ভাল জিনিসই বাজারে আসুক তাতে কিছু যায় আসেনা। তাঁরা ভাবেন একদিন এডিসন এমন কিছু আবিষ্কার করে বাজারে ছাড়বেন, যে তাঁদের ব্যবসা একেবারে শেষ হয়ে যাবে। গ্যামনরা তাই ভিটাস্কোপের গায়ে লিখতে চাইলেন এডিসনের নাম এবং অবশ্যই আরমাটেরও নাম থাকবে যন্ত্রের পরিকল্পনাকারী হিসেবে। আরমাটকে তাঁরা এই প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, কোন অনুসন্ধানকারী যাতে বিভ্রান্ত না হয়, সে ব্যাপারে তাঁরা যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নেবেন। আরমাটকে সম্মত হতে হ'ল।

ভিটাস্কোপের ব্যাপারে চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হ'ল। এডিসন তাঁর মূল্যবান নাম ব্যবহারের অনুমতি দিলেন। ১৮৯৬ সালের মার্চ মাসের শেষ দিকে তাঁর কারখানায় তৈরী হয়ে গেল দশখানা মেশিন। ১লা এপ্রিল আরমাট এলেন কাজকর্ম্ম দেখাশোনা করতে এবং ৩রা এপ্রিল, এডিসনের ওয়েষ্ট অরেঞ্জের গবেষণাগারে সাংবাদিকদের সাথে বসে এডিসন প্রথমবারের মত স্বচক্ষে দেখলেন ভিটাস্কোপ যন্ত্র। আরমাট দাঁড়িয়ে রইলেন জনতার পেছনের সারিতে।

পরের দিন, ১৮৯৬ সালের ৪ঠা এপ্রিল নিউইয়র্ক হেরাল্ড (New York Herald), নিউইয়র্ক জার্নাল (New York Journal) ইত্যাদি কাগজে এডিসনের নবতম আবিষ্কার হিসেবে ভিটাস্কোপের বিস্তারিত বিবরণ এবং ভূয়সী প্রশংসা প্রকাশিত হ'ল।

পুরো ব্যাপারটাতে এডিসনের প্রতিক্রিয়া এক অদ্ভুত ধরণের ছিল। পরপর দুটো ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে এ ব্যাপারে। ১৮৯৮ সালে এক মামলার সাক্ষ্যদানকালে এডিসন, ফিল্মের অবিরাম গতি প্রয়োগের ব্যাপার ছাড়া আরমাটের যন্ত্রকে প্রায় কিনেটোস্কোপ বলে অভিহিত

করেছেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, এডিসনের আগেকার কাজের মধ্যে কোন অবস্থাতেই আমরা প্রক্ষেপণের প্রস্তাব দেখতে পাইনি। র‍্যাফ-গ্যামনদের চাপে পড়ে তিনি শুধুমাত্র কেইসারকে কাজে পাঠিয়েছিলেন। তিনি নিজে এ ব্যাপারে চেষ্টা করা তো দূরে থাকুক চিরকাল প্রক্ষেপণের বিরোধীতাই করে এসেছেন। আর, ভিটাস্কোপ আদপেই চোখ লাগিয়ে দেখার যন্ত্র ছিল না। আরমাটের যন্ত্রের ব্যাপারে তিনি একথাও বলেছিলেন যে, কিছুদিন আরমাটের পদ্ধতি ব্যবহারের পর, ফিল্মের সবিরাম গতি তিনি তাঁর নিজস্ব পুরনো পন্থায় (Geneva stop movement) পাল্টে নিয়েছিলেন।

(... Raff and Gammon got hold of this man named Armat and they wanted us to build the machine. The machine was brought over and we saw it was our machine except that it had a different movement for feeding the film along intermittently. Messrs. Raff & Gammon wanted us to build that machine and they wanted to use my name and as the movement seemeed to be good one and could be built very quickly and cheaply, I gave them permission to use my name for the reason that all there was in the machine that we did not have was simply his movement. And the machines were made and built by us and called the Edison Vitascope and the whole thing was mine, except that one movement of Mr. Armats.

We don't use Armat movement any more but use our original Geneva stop movement"...)

আবার এর পরবর্তীকালে চলচ্চিত্র ইতিহাসে তথ্যের বিভ্রান্তি নিয়ে, ১৯২২ সালের মে মাসে তিনি এক চিঠিতে আরমাটকে ভিটাস্কোপের ব্যাপারে পূর্ণ স্বীকৃতি দেন।

('...You will probably notice that in interviews given by me I have stated that I had a projection machine, but that when you came on the scene I saw you had a very much

better one than mine, and that I dropped my experiments and built yours, which was the first practical projection machine').

যাইহোক, নিউইয়র্কের কোস্টার-বায়ালে (Koster & Bial's Music Hall, 34th Street, Herald Square) ১৮৯৬ সালের ২০শে এপ্রিল, এডিসনের নবতম আবিস্কার 'ভিটাস্কোপ' প্রদর্শনীর বিজ্ঞাপন দেওয়া হ'ল। ছবি দেখান শুরু হ'ল ২৩শে এপ্রিল থেকে। কুড়ি ফুট পর্দায় প্রক্ষিপ্ত ছবিগুলোর মধ্যে পলের তোলা Surf at Dover ছবিও ছিল।

কোস্টার বায়ালে যে ভিটাস্কোপ ব্যবহার করা হয়েছিল, তা কিনেটোস্কোপের পদ্ধতি অনুযায়ী পুলির সাহায্যে গুটিয়ে নেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছিল, ফলে বার বার ফিল্ম খুলে আবার বিন্যস্ত করার দরকার ছিল না, যতবার খুশি দেখান সম্ভব ছিল।

সেদিনের প্রেক্ষাগৃহে ছিল উপ্‌চে পড়া ভীড়। দর্শকরা আনন্দে জয়ধ্বনি করতে লাগলেন এডিসনের। আরমাট প্রক্ষেপণের ঘর থেকে শুনতে পাচ্ছিলেন সে ধ্বনি।

ভিটাস্কোপের জনপ্রিয়তা স্বাভাবিকভাবেই এর দামও বাড়িয়েছিল। এদিকে র‍্যাফ-গ্যামন আরমাটকে ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, জার্মানী, ইটালী ইত্যাদি সমস্ত দেশে তাঁর যন্ত্রের পেটেণ্ট নিয়ে নিতে বললেন।

ভিটাস্কোপকে এবার বিদেশে ব্যবসার জন্য পাঠাবার চেষ্টা চলতে থাকল, সিন্‌কুভালি (Paul Cinquevalli) নামে ভদ্রলোকের মারফৎ। তিনি লণ্ডনে এসে দেখলেন পলের থিয়েট্রোগ্রাফ এবং লুমিয়েরদের সিনেমাটোগ্রাফের মধ্যে জোর প্রতিযোগিতা চলেছে।

ইতিমধ্যে পল তাঁর যন্ত্রে হেপওয়ার্থের (Cecil Hepworth 1874-1953) তৈরী বৈদ্যুতিক আর্কল্যাম্প লাগিয়েছেন যার আলো নিয়ন্ত্রণযোগ্য ছিল। পলের যন্ত্র ভীষণ জনপ্রিয় হয় এবং লণ্ডনের অলিম্পিয়াতে একটানা প্রায় চার বছর চলে।

এর মধ্যে আবার রেনডের প্র্যাক্সিনোস্কোপ দ্বারা প্রভাবিত গ্রীনের যন্ত্রও ব্যবসায়ে নেমে পড়ার চেষ্টা চালাচ্ছে (এ ব্যাপারে গ্রীন, পলের

থিয়েট্রোগ্রাফের বিরুদ্ধে মামলা করেন আবিষ্কারের অগ্রাধিকারের জন্য এবং সে মামলায় তাঁর হার হয়)।

লুমিয়েরদের ছবিও কম জনপ্রিয় ছিল না। র‍্যাফ-গ্যামনদের বিক্রয় প্রতিনিধি ওয়েবস্টার (Charles H. Webster) লণ্ডনে এসে সিন্‌কুয়্যাভালির সাথে দেখা করেন ১৮৯৬ সালের ৩০শে এপ্রিল। কোম্পানীর কাছে লণ্ডন থেকে লেখা তাঁর চিঠি থেকে জানা যায়, কত কম খরচে লুমিয়েররা তাঁদের ছবি তুলতেন, সপ্তাহে অন্তত দুবার ছবি পাল্টে দিয়ে এবং লণ্ডন শহরের বিভিন্ন জায়গার ছবি তুলে দর্শকদের দেখিয়ে, মাত্র তিনখানা মেসিনেই কিভাবে লণ্ডন শহর মাতিয়ে তুলেছিলেন।

কেমপ্‌ (George Kemp) নামে ভিটাস্কোপের আরেক প্রতিনিধি, বুদাপেষ্ট, ভিয়েনাতেও লুমিয়েরদের একই রকম সাফল্যের ছবি দেখে-ছিলেন। লুমিয়েরদের ক্যামেরা প্রজেক্টার ছিল কায়িক শক্তি দ্বারা চালিত এবং তাঁদের যন্ত্রে আলোর ব্যবস্থা ছিল ইথারের, ফলে তারা জনগণের বৃহত্তর অংশের কাছে সহজেই পেঁছিতে পেরেছিলেন।

তবু কার্যকরী দিকের তুলনামূলক বিচার করলে দেখা যাবে, ভিটা-স্কোপের চেয়ে সিনেমাটোগ্রাফের চলচ্চিত্র অনেক নিম্নমানের ছিল। ভিটাস্কোপে যেহেতু শাটার ছিল না, তাই প্রক্ষিপ্ত চিত্র অনেক বেশী উজ্জ্বল, স্থির এবং স্বচ্ছন্দ ছিল।

সমকালীন উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী

(—১৮৯৫)

ফ্রান্স :

সেজানের (Paul Cezanne) আগেকার আঁকা ছবির প্রদর্শনী হ'ল (Retrospective)। তাঁর তখন ছাপান্ন বছর বয়স— 'Boy in the Red Waist Coat' ছবি শেষ করলেন।

মরিসট (Berthe Morisot) এবং পাস্তুর (Louis Pasteur) লোকান্তরিত হলেন।

মানে (Edouard Manet) এবং গঁগ্যার (Paul Gauguin) প্রদর্শনী বিশেষ প্রশংসা পেল। লুত্রে (Toulouse Lautrec) 'May Belfort' ছবির পরিমালা শেষ করলেন।

জীদ (Andre Gide) বিয়ে করলেন তাঁর মাসতুতো বোনকে। তার Paludes-এর কাজ শেষ হ'ল।

সাতি (Erik Satie) শেষ করলেন তাঁর 'Messe des Pauvres'-এর স্বরলিপি।

অ্যামেরিকা :

জিলেট (Gillette) আবিস্কার করলেন Safety razor। ক্রেন (Stephen Crane) লিখলেন 'Red Badge of Courage', যেটা ছাপান্ন বছর পরে চলচ্চিত্রায়িত হ'ল হাস্টনের হাতে (John Huston)।

ইংল্যাণ্ড :

পিনেরো (Sir Arthur Pinero) লিখলেন 'The notorious Mrs. Ebbsmith'।

ওয়াইল্ড (Oscar Wilde) শেষ করলেন 'The Importance of Being Earnest' এবং কুইনসবেরীর (Lord Queensberry) বিরুদ্ধে মামলায় পরাজিত হয়ে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হলেন।

জার্মানী :

রন্‌ট্‌জ্যান (Wilhelm Rontgen) আবিষ্কার করলেন X-Ray। স্ট্রাউস (Richard Strauss) শেষ করলেন 'Till Eulenspiegel'। এদিকে Kiel Canal উন্মুক্ত করা হ'ল।

রাশিয়া :

তলস্তয় (Lev Tolstoy) লিখছেন 'Master and Man'। শেকভ্‌ (A. Chekov) শেষ করলেন 'The Seagull'।

ইটালী :

মার্কনি (Marconi) আবিষ্কার করলেন Wireless Telegraphy।

পোল্যাণ্ড :

Henry Sienkiewicz শেষ করলেন Quo Vadis। ইটালিতে এই উপন্যাস ছবি হ'ল ১৯১২ এবং ১৯২৪ সালে ; অ্যামেরিকাতে ১৯৫১ সালে।

চলচ্চিত্রের প্রয়োজনীয় যন্ত্রের উন্নতি এবং বিবর্তনের সাথে সাথে মানুষের রুচি এবং চাহিদারও পরিবর্তন ঘটছিল। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা যতখানি যান্ত্রিক ব্যাপারে গুরুত্ব দিচ্ছিলেন, চলচ্চিত্রের বিষয়বস্তুর দিকে ততখানি নজর দিচ্ছিলেন না। ফলে, বাজারে ছাড়া ছবির জনপ্রিয়তা ক্রমশ কমে আসছিল। ১৮৯৬ সালের মাঝামাঝি সময়ে এ ব্যাপারগুলো লক্ষ্য করা যাবে।

ছবির ব্যাপারে এই ধরণের সমস্যার মুখোমুখি হলেন র‍্যাফ এবং গ্যামন এবং তাঁদের বিক্রয় প্রতিনিধি কিথ্ কোম্পানী (Keith Amusement Enterprises) এবং এই ব্যবসায়ে যুক্ত অন্যান্য ব্যক্তিরা।

তখনকার দিনে ব্ল্যাকমারিয়া স্টুডিওতে যে সমস্ত শিল্পীরা আসতেন, তাঁদের পারিশ্রমিক ছিল আসা-যাওয়ার খরচ বাদে দশ থেকে পনেরো ডলার। বিষয়বস্তুর আকালে যখন শিল্পীর (বিশেষ শারীরিক দক্ষতা সম্পন্ন ব্যক্তিদের) জন্য খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া হ'ল, তখন এমন ভীড় শুরু হ'ল যে পারিশ্রমিক কমতে কমতে একদিন বিনা-পয়সার শিল্পীদের ভীড় সামলানোই মুস্কিল হয়ে উঠল।

ক্রমাগত নতুন ছবির চাহিদা এবং ব্ল্যাকমারিয়াতে বিভিন্ন প্রকার অসুবিধার জন্য নিউইয়র্ক শহরের মধ্যেই বানান হ'ল একটা নতুন চলচ্চিত্র স্টুডিও। স্টুডিও তৈরী হ'ল র‍্যাফ গ্যামন কোম্পানীর অফিসের ছাদে। এডিসন ক্যামেরা, ক্যামেরাম্যান ইত্যাদি পাঠাতে সম্মত হলেন। রসায়নাগারের বাকী কাজ ওয়েষ্ট অরেঞ্জ স্টুডিওতেই করা হবে ঠিক হ'ল।

যাই হোক, যখন ভিটাস্কোপ এবং সিনেমাটোগ্রাফ চলচ্চিত্র ব্যবসায় যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে ফেলেছিল, ল্যাথামদের ভেতরে তখন আবার গোলমাল লাগল।

রেকটর এবং টিলডেন এই দুজন অপরিহার্য্য ব্যক্তির সাথেই ল্যাথাম ভাইদের অসন্তোষ শুরু হ'ল। এরই ফলে লাম্‌ডা কোম্পানী দুভাগ হয়ে গেল।

রেকটর-টিলডেন তাঁদের অংশ নিয়ে লামৃডা কোম্পানীতেই থেকে গেলেন, আর ল্যাথামরা নতুন সংস্থা তৈরী করলেন আইডোলোস্কোপ যন্ত্রের নামে Eidoloscope Company।

লামৃডা কোম্পানীর পরবর্তী কাজ হ'ল করবেট-ফিৎসিমন্‌সের (Bob Fitzsimmons) মুষ্টিযুদ্ধের ছবি। ১৭ই মার্চ, ১৮৯৭ সালে তোলা প্রায় এগারো হাজার ফুটের এই ছবি পৃথিবীতে একটা ঘটনার জন্য তোলা ছবিগুলোর মধ্যে দীর্ঘতম। এই ছবি তোলার জন্য রেকটর ব্যবহার করেছিলেন চারখানা ক্যামেরা। ক্যামেরাগুলো যোগাড় করেছিলেন এডিসনের কাছ থেকে। বিভিন্ন ধরণের জটিল ব্যবসায়িক সম্পর্ক এবং তীব্র প্রতিযোগিতা থাকা সত্ত্বেও তিনি এডিসনের সাথে সম্পর্ক সুন্দর রেখেছিলেন। এই ক্যামেরাতে রেকটর সংযোজন করেছিলেন কম আলোতে প্রতিচ্ছবি গ্রহনের কার্যকরী ক্ষমতা এবং সেকেণ্ডে আটচল্লিশ ফ্রেমের বদলে চব্বিশ ফ্রেমে কমিয়ে এনেছিলেন ফিল্মের খরচ।

রেকটরের তৈরী প্রক্ষেপণ যন্ত্র ভেরিস্কোপের (Veriscope) নাম অনুযায়ী ভেরিস্কোপ কোম্পানী (Veriscope Company) ১৮৯৭ সালের গ্রীষ্মে Academy of Music Hall-এ দেখাতে শুরু করল এই ছবি। তারপর, জুলাই মাসে ব্রুকলীনের (Brooklyn) Park Theatre এ দেখান হ'ল। এইভাবে সমগ্র অ্যামেরিকাতে এই ছবি ছড়িয়ে পড়ল।

এদিকে ল্যাথামদের সংস্থা ভাগ হয়ে যাওয়াতে, মেজর ল্যাথামের অবস্থা খুব খারাপ হয়ে উঠল। কারিগরী দক্ষতার ব্যাপার বিবেচনা করলে রেকটরের সংস্থা অনেক বেশী শক্তিশালী ছিল। ব্যবসাকে আবার নতুন করে দাঁড় করানোর আশায় মেজর ল্যাথাম, এন্থনির (F. A. Anthony) সাথে কথা বললেন। পরবর্তীকালে এন্থনির সংস্থা E. & H. T. Anthony & Company বিখ্যাত হয়েছিল Ansco Company নামে। সেই সময়ে এন্থনি কোম্পানীর ছিল ফটোগ্রাফীর জিনিসপত্রের ব্যবসা।

এন্থনি কোম্পানী বারোখানা প্রজেক্টার তৈরীর জন্য ল্যাথামদের অর্থ সাহায্য করল এবং এই প্রজেক্টার যা আগে আইডোলোস্কোপ নামে পরিচিত ছিল, এবার তা বাইঅপ্‌টিকন (Biopticon) নামে বাজারে ছাড়া হবে এরকম সিদ্ধান্ত নেওয়া হ'ল।

বাইঅপ্‌টিকনে দেখানর জন্য, মেক্সিকোতে ষাঁড়ের লড়াই-এর ছবি তোলার জন্য অট্‌ওয়ে ল্যাথাম রওনা হলেন। যথাসময়ে ছবি তুলে পাঠানোর পথে ঘ'টল এক বিপত্তি। মেক্সিকোর সীমান্তের শুল্ক বিভাগের লোকেদের অজ্ঞতায় অর্ধেক ছবি নষ্ট হয়ে গেল। যাইহোক, বাকী ছবি নিউ ইয়র্কের সেণ্ট জেম্‌স হোটেলে দেখান হ'ল। ক্যামেরা ঘোরানর (Pan) ব্যবস্থা না থাকার ফলে, এবং ছবি কাটা-জোড়ার ব্যবস্থা অজানা থাকায় পর্দায় অনেক সময় শুধু মাত্র ষাঁড়ের যুদ্ধের ধুলোর ছবিই দেখা গেল। এরকম ত্রুটি নিয়েও এই ছবি, বিষয়বস্তুর অভিনবত্বে জনপ্রিয় হয়েছিল।

এদিকে ল্যাথামদের প্রজেক্টারের দাম এত বেশী পড়ে গিয়েছিল, এন্থনি কোম্পানী প্রজেক্টার বাজারে ছাড়বেন কিনা এ ব্যাপারে দ্বিধাগ্রস্থ হয়ে পড়েছিলেন। এ ছাড়া প্রজেক্টারে শাটারের অনুপস্থিতি এবং বিখ্যাত ল্যাথাম লুপের ব্যবহার যথাক্রমে আরমাট এবং রেকটরের আবিষ্কারের সুযোগ নেওয়ার ফলে আইনগত ঝামেলার উৎপত্তি হ'ল (Patent office record, interference Case No. 18461)। এই আইন যুদ্ধে ল্যাথামদের কোন লাভ হ'ল না।

এরপর ১৯০১ সালে এন্থনি কোম্পানী, Goodwin Camera & Film Company অধিগ্রহণ করল। আবার ১৯০২ সালে, Eastman Kodak Company-র সাথে (Ansco Co. নামে) শুরু হল মামলা। ল্যাথামদের ব্যাপারে এন্থনি কোম্পানী এ পর্য্যন্ত প্রায় দশ হাজার ডলার খরচ করে ফেলেছিল। নতুন কোম্পানী চালু রাখা এবং মামলার খরচ সামলে ল্যাথামদের পেছনে টাকা ঢালার মত অবকাশ আর রইল না। যান্ত্রিক প্রয়োগ বিদ্যার ক্ষেত্রে অনেক বেশী দক্ষ ব্যক্তিরা ক্রমশ আসতে শুরু করেছেন, নতুন চিন্তা নতুন কর্ম নিয়ে চলচ্চিত্রের জগৎ ক্রমশ আরও বেশী প্রতিযোগিতাময় হয়ে উঠতে থাকল। এই রকম অবস্থায় ল্যাথামরা বিদায় নিলেন চলচ্চিত্র ব্যবসার জগৎ থেকে।

১৮৯৫ সালের শেষদিকে শিকাগো শহরে আরেক ব্যক্তি কিনেটো-স্কোপের সাহায্যে চিত্র প্রক্ষেপণে উৎসাহী হয়ে উঠলেন। এই ব্যক্তির নাম আমেট (Edwin Hill Amet)। আমেট তখন বিখ্যাত হয়ে উঠেছেন স্বয়ংক্রিয় ওজনের যন্ত্র আবিষ্কার করে (বর্তমানে সিনেমা হলে যে ওজন নেবার যন্ত্র আমরা দেখি)।

কিনেটোস্কোপের ব্যাপারে কাজ চালাবার মত আর্থিক আনুকূল্য তাঁর ছিল না। এই প্রয়োজনের সূত্রেই তাঁর সাথে যোগাযোগ হয় থিয়েটার জগতের লোক স্পুরের (George K. Spoor) সাথে। আর এই সাক্ষাৎকারের ফলেই পরবর্তীকালে জন্ম হয়েছিল বিখ্যাত 'Essanay Concern'-এর।

স্পুরের আর্থিক সাহায্য নিয়ে আমেটের কাজ এগিয়ে চ'লল। ১৮৯৬ সালের প্রথম দিকে তাঁর কাজ শেষ হ'ল। ক্লেইন (George Kleine) নামে এক ব্যবসায়ীর (magic lantern, stereoopticon ইত্যাদির ব্যবসায়ী) মাধ্যমে আমেটের যন্ত্র বাজারে ছাড়া হ'ল। ক্লেইন এই যন্ত্রের নাম রাখলেন 'ম্যাগ্নিস্কোপ' (Magniscope)।

এবার শিকাগো শহর ছেড়ে অনেক দূরে টেকসাসের ডালাস শহরে আমরা চলে আসবো। ডালাস শহরে কিনেটোস্কোপের প্রদর্শনী দেখে মুগ্ধ হলেন সেলিগ (William N. Selig) নামে এক তরুণ। সেলিগের ফটোগ্রাফী ছাড়া বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় অনায়াস দক্ষতা ছিল। কিনেটোস্কোপে চোখ লাগিয়ে চলচ্চিত্র দেখার পর তাঁর স্বাভাবিক উৎসাহ এল এই ছবিকে প্রক্ষিপ্ত অবস্থায় নিয়ে যাওয়ার। সেলিগ ডালাসে এসেছিলেন স্বাস্থ্য উদ্ধারকল্পে। তাঁর বাড়ী ছিল আমেটের শহর শিকাগোতেই। চলচ্চিত্রের ভাবনা নিয়ে সেলিগ ফিরে এলেন নিজের শহরে। ছোটখাটো কারখানা তৈরীর উপযুক্ত একটা জায়গা ভাড়া নিয়ে শুরু হ'ল তাঁর নিরলস প্রচেষ্টা। ল্যাথাম, আরমাট, লুমিয়ের বা পলের মত একইভাবে বিভিন্ন পর্য্যায় পার হলেন তিনি। সেলিগের কাজ

চলাকালীন অবস্থাতেই শিকাগো শহরে এল ল্যাথাম এবং লুমিয়েরদের ছবি শিলার থিয়েটারে (Schiller Theatre)। সেলিগ এঁদের ছবি দেখলেন এবং কিছু নমুনাও সংগ্রহ করে নিয়ে এলেন।

সেলিগ তাঁর যন্ত্রের নক্শা নিয়ে একদিন 'Union Model Works' নামে এক সংস্থায় গেলেন যন্ত্রকে বাস্তব রূপ দেওয়ার জন্য। এই সংস্থায় ছিলেন সুস্তেক (Andrew Schustek) নামে এক দক্ষ কর্মী। সুস্তেক কিছুদিন আগে এক অজ্ঞাত পরিচয় ফরাসী ভদ্রলোককে লুমিয়েরদের সিনেমাটোগ্রাফের একটা নকল তৈরী করে দিয়েছিলেন। সেলিগের সাথে সুস্তেকের ঘনিষ্ঠতা হবার পর, সুস্তেক সিনেমাটোগ্রাফের অংশগুলোর নকশা সেলিগকে দেখালেন। সেলিগের তৈরী নকশা এবং সিনেমাটোগ্রাফের নকশার সংমিশ্রণে এবং সুস্তেকের কারিগরী দক্ষতায় সৃষ্টি হ'ল পরবর্তীকালের বিখ্যাত সেলিগ ক্যামেরা (Selig Standard Camera) এবং সেলিগ প্রক্ষেপণ যন্ত্র (Selig Polyscope)।

'Selig Polyscope Company' নামে সেলিগের চলচ্চিত্র ব্যবসা শুরু হ'ল শিকাকো শহর থেকে। 'The Tramp and the Dog' ছিল তাঁদের তৈরী সবচেয়ে জনপ্রিয় ছবি।

১৮৯৬ সাল, অ্যামেরিকার চলচ্চিত্র জগতে এক বিশেষ বিশৃংখলার বছর। চলচ্চিত্র ব্যবসায় সহজেই টাকার প্রলোভনে বহু ব্যক্তি এসে পড়লেন। সবার যন্ত্রই নকল হতে থাকল ভীষণভাবে। পেটেণ্ট অধিকার বলে কোন কিছু আর রইল না।

এই রকম এক সময়ে, এডিসন কোম্পানীর তরফ থেকে নতুন যন্ত্র Projecting Kinetoscope উন্মুক্ত বাজারে বিক্রি করার কথা ঘোষণা করা হ'ল। স্বাভাবিকভাবেই এতে ভিটাস্কোপের বাজার ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা দেখা দিল। র‍্যাফ-গ্যামন কোম্পানী, যাঁরা দীর্ঘকাল ধরে এই ব্যবসার সাথে জড়িত ছিলেন তাঁরা পড়লেন মহা বিপদে। আর এই সূত্রেই, এডিসনের সাথে তাঁদের দীর্ঘ দিনের সম্পর্ক ছিন্ন হ'ল। ঘটনাটা ঘটল ১৮৯৬ সালের নভেম্বর মাসে। এডিসনের নতুন যন্ত্রকে আখ্যা দেওয়া হ'ল ভিটাস্কোপের উন্নত সংস্করণ। ভিটাস্কোপ বাজারে ছাড়া হয়েছিল আঞ্চলিক অধিকারের ভিত্তিতে কিন্তু Projecting Kincto-scope এর ক্ষেত্রে কোনরকম বাধানিষেধ রইল না। দেশের যে কোন অঞ্চলে, যে কেউ এই যন্ত্র কিনে ব্যবহার করতে পারবেন এই স্বাধীনতা দেওয়া হ'ল।

এর পর এলো Animatoscope। হাউই (Lyman Howe) পরিচয় করিয়ে দিলেন চলচ্চিত্রের এই নতুন যন্ত্রের সাথে। হাউইর চলচ্চিত্রের ব্যবসায় আসার পিছনে একটু ইতিহাস আছে। এডিসনের ফনোগ্রাফ যখন বাজারে ছাড়া হয়েছিল তখন তা ছিল একবারে একজনের শোনার উপযুক্ত। এতে লাগান একটা নল কানে লাগিয়ে গান বা বাজনা শুনতে হ'ত। হাউই এই যন্ত্রে এক ধরণের চোঙা লাগানোর ব্যবস্থা করলেন যাতে একসাথে অনেক লোক শোনার উপযুক্ত হয়ে গেল এডিসনের ফনোগ্রাফ। হাউই ১৮৯৬ সালের ১৩ই মার্চ চলচ্চিত্র ব্যবসার উদ্দেশ্যে এডিসনের কাছে ভিটাস্কোপ প্রদর্শনের অধিকার চেয়েছিলেন সমগ্র

পেনসিলভ্যানিয়া স্টেটের। র‍্যাফ-গ্যামন কোম্পানীর সাথে আগে চুক্তি থাকার ফলে তাঁর প্রস্তাব অগ্রাহ্য হয়। এর ফলে হাউই বিশেষ আহত হন এবং নিজেই যন্ত্র তৈরীর প্রচেষ্টায় নেমে পড়েন। এরই ফলশ্রুতি এ্যানিমেটোস্কোপ।

এই যন্ত্রের একটা বিশেষত্ব ছিল। তখনকার দিনে প্রজেক্টারে ওপরের রীল থেকে নেমে আসা ফিল্মগুলো জড়ো হ'ত তলায় রাখা একটা পাত্রে। এ্যানিমেটোস্কোপের ক্ষেত্রে তলার দিকেও ব্যবহার করা হ'ল আরেকটা রীলের যার মধ্যে ফিল্ম সরাসরি গুটিয়ে নেওয়া সম্ভব ছিল। ফলে পরেরবার ছবি দেখানোর সময়ে অনেকখানি পরিশ্রম লাঘব হ'ত। সম্ভবত পৃথিবীতে এ্যানিমেটোস্কোপেই প্রথমবার ব্যবহৃত হয়েছিল এই পদ্ধতি। যদিও এটা নকল হয়ে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়তে বিশেষ সময় লাগলনা।

সমুদ্রের ওপারে, অর্থাৎ ইউরোপের দিকে তখন সবচেয়ে জমজমাট বাজার লুমিয়েরদের। দূরদূরান্তরের দেশ ঘুরে বেড়াতে লাগল সহজে বহনযোগ্য এবং বিদ্যুতের ওপর আদৌ নির্ভরশীল নয় লুমিয়েরদের তৈরী সেই ক্যামেরা-প্রজেক্টার। ছবি শুধু দেখানই হ'ত না, যে দেশে এই প্রদর্শনী যেত, সেখানকার কৃষ্টি আচার-অনুষ্ঠান, জীবনযাত্রা, দর্শনীয় স্থান ইত্যাদির ছবিও তুলে আনতেন প্রতিনিধিরা। কোন জায়গায় পেঁছনর কিছুদিন আগে থাকতেই শহরে বিজ্ঞাপন পড়ে যেত আগমনের বার্তা ঘোষণা করে। দলে দলে লোক এসে ভীড় করত ছবি দেখা এবং কিভাবে ছবি তোলা হয় তা দেখার আগ্রহে। লুমিয়েরদের ক্যামেরায় এককালীন তেরো (১৩) মিটার বা পঁয়তাল্লিশ (৪৫) সেকেণ্ড চলার মত ফিল্ম নেওয়ার ক্ষমতা ছিল। কিন্তু এমনও হ'ত, শুটিং দেখায় আগ্রহী জনসাধারণ যারা কিনা আবার সিনেমারও দর্শক তাদের খুশী রাখার জন্য তাদের দিকেই ঘণ্টার পর ঘণ্টা খালি ক্যামেরাই চালাতে হচ্ছে।

রাশিয়াতে লুমিয়েরদের ছবি দেখানোর সময় হ'ল এক মজার ব্যাপার। সাধারণত লুমিয়েরদের ছবি দেখার জন্য প্রবেশমূল্য ছিল দুই ফ্রাঁ—সবার জন্যই। কিন্তু এদেশে উচ্চ নীচ ভেদাভেদ একটু বেশি থাকায় সমাজের উচ্চস্তরের মানুষরা চাইলেন অন্যরকম ব্যবস্থা। পর্দার দশফুটের মধ্যেকার আসনের দাম হ'ল সবচেয়ে বেশি—এক রুবল ; কারণ

বড়লোকদেরইতো স্বাভাবিকভাবে সবার আগে বসার অধিকার। কিছুক্ষণ ছবি চলার পরে দেখা যেত চোখের অস্বস্তিতে বড়লোকেরা চলেছেন পিছনের দিকে গরীবদের জন্য নির্দ্ধারিত 'পনের' কোপেকের আসনের দিকে।

লুমিয়েরদের মেশিন থাকত খুবই নিরাপত্তার ভেতরে। প্রতিনিধিদের প্রতি কড়া নির্দেশ ছিল, দিনরাত কোন সময়েই মেশিন হাতছাড়া করা চলবেনা। ফলে এমনও দেখা যেত যে কোন অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রিত লুমিয়ের প্রতিনিধি খেতে বসলেও দু'পায়ের ফাঁকে সিনেমাটোগ্রাফ সযত্নে রাখা আছে।

এই কঠিন নিরাপত্তাও বিশেষ কিছু করে উঠতে পারলনা। মনে করা হয় বার্লিনের বাসিন্দা স্ক্লাডানোস্কি (Max Skladanowski) ইউরোপের কোন শহরে দেখে এই সিনেমাটোগ্রাফ থেকেই অনুপ্রাণিত হন। ১৯২৪ সালের 'Fox News' নামে এক চলচ্চিত্র পত্রিকায় তাঁর নামের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়। এখানে এমনও বলা হয়েছিল যে স্ক্ল্যাডানোস্কির আবিষ্কৃত যন্ত্রই নাকি পৃথিবীর প্রথম চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর যন্ত্র। ১৮৭০ সালে তিনি কাজ শুরু করেন এবং ১৮৮৮ সালে তাঁর কাজ শেষ হয়। তাঁর নির্মিত ছবিগুলোর মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ছবি ছিল ১৮৯০ সালে তৈরী বিসমার্কের উপরে তোলা ছবি। পরবর্তীকালে এ-ব্যাপারে অনুসন্ধানের ফলে জানা যায় যে তাঁর যন্ত্র সেলুলয়েড আবিষ্কার হওয়ার পরের এবং ১৮৯৬ ৯৭ সালে তৈরী অন্যান্য যন্ত্রের থেকে আলাদা কোন বৈশিষ্ট্য এই যন্ত্রের ছিল না। বিসমার্কের অন্যতম ঘনিষ্ট ব্যক্তি হার্ডেনকে (M. Harden) প্রশ্ন করে জানা যায় বিসমার্কের উপরে কোন ছবি কোনদিনও তোলা হয়নি। খুব সম্ভবত স্ক্ল্যাডানোস্কির বিসমার্ক জার্মান থিয়েটারের কোন অভিনেতা।

চলচ্চিত্রের পটভূমিতে এখন পরপর কয়েকটি ঘটনা ঘটে গেল। পাথে (Charles Pathe : 1863-1957) তৈরী করলেন নতুন ক্যামেরা। প্রায় সাথে-সাথেই এল গ্যমোর (Leon Gaumont : 1864-1946) তৈরী লুমিয়েদের চেয়ে সামান্য উন্নত ধরনের ক্যামেরা। এলেন মেলিস (George Melies : 1861-1938)। ১৮৯৫-৯৬ সালে তিনি গিয়েছিলেন লুমিয়েরদের কাছে সিনেমাটোগ্রাফ কেনার জন্য। কিন্তু লুমিয়েরদের

কাছে প্রত্যাখ্যাত হলেন। ধৈর্য্য না হারিয়ে R. W. Paul-এর কাছ থেকে একটা প্রোজেক্টার কিনলেন। নিজেই তৈরী করলেন তাঁর ক্যামেরা। তাঁর ক্যামেরায় ব্যবহৃত হল লুমিয়েরদের চেয়ে অনেক বড় মাপের ফিল্ম। অবশ্য কিছুদিন বাদে এডিসনের মাপকেই তিনি পাকাপাকিভাবে গ্রহণ করলেন।

মেলিস ছিলেন প্রতিভাবান ম্যাজিসিয়ান এবং শিল্পী। বড়লোকের ছেলে মেলিস লেখাপড়াতেও ছিলেন ভালো। পড়াশোনার শেষে কিছুদিন সামরিক শিক্ষাও নিয়েছিলেন। এরপর La Griffe নামে এক পত্রিকায় কিছুদিন কাজ করেন। ১৮৮৪-৮৫ সালে তাঁর বাবা মা তাঁকে ইংলণ্ডে পাঠালেন ইংরাজী ভাষা শিক্ষার জন্য। ভাষা শিক্ষার জন্য ক্রমাগত নাটক পড়ে পড়ে যখন ক্লান্তি এসে যেত তখন পড়ার চেয়ে দেখার অংশ যেখানে বেশি অর্থাৎ নাটক দেখতে চলে যেতেন। বোধহয় এই ভাবেই তাঁর ম্যাজিকের প্রতি আগ্রহ জন্মায়। ১৮৮৮ সালে বিয়ের পর তিনি Robert Houdin থিয়েটার ইজারা নিয়ে শুরু করেন তাঁর কর্মময় জীবন। থিয়েটারের তিনি ছিলেন একাধারে লেখক, প্রযোজক, শিল্পনির্দেশক, অভিনেতা এবং পরিচালক। ম্যাজিক, মূকাভিনয় এবং প্রদর্শন কলা-কৌশলের মিশ্রণে ফরাসী থিয়েটারে তিনি নিয়ে এলেন এক নতুন অভিজ্ঞতা। চলচ্চিত্রে মেলিসের ভূমিকা থিয়েটারের মতই বহুমুখী। তাঁর তৈরী স্টুডিওকেই (Montreuil-Sous-Bois-তে) বাস্তবিক প্রথম ফিল্ম স্টুডিও বলা চলে। এখানে ১৮৯৬-১৯৩৪ সাল পর্যন্ত নির্মিত হয়েছিল প্রায় একহাজার ছবি, যাদের দৈর্ঘ্য ছিল তিন মিনিট থেকে কুড়ি মিনিট দেখাবার উপযুক্ত। সেই সব ছবিতে ছিল মেলিসের দক্ষ প্রদর্শন ভঙ্গিমা, চিন্তার অভিনবত্ব, এবং ক্যামেরার চোখে ম্যাজিককে সুসঙ্গতভাবে উপস্থাপন। তাঁর তৈরী Miscs-en-Scene, Cendrillon (1889), Off to Bloomingdale Asylum (1901), Le voyage dans le Lune (1902), La Fee Carabosse (1906), 20,000 Lieues sous les mars (1907) ইত্যাদি বহু বিখ্যাত ছবির নাম করা যায়।

প্রথম দিকে কিছুকাল পাথে কোম্পানী মেলিসের ছবির পরিবেশক ছিল। এদের সাথে তাঁর সম্পর্ক ছিন্ন হয় যখন মেলিসের 'Cendrillon'-এর

দৈর্ঘ্য ২০০০ ফুট থেকে কমিয়ে ৯০০ ফুটে আনা হ'ল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে চলচ্চিত্রের বিষয় এবং রুচির ক্ষেত্রে এক বিরাট পরিবর্তন আসে। চলচ্চিত্র ব্যবসা হয়ে ওঠে প্রচণ্ড প্রতিযোগিতাময়, যেখানে মেলিসের মত সুন্দর সৎ লোকের স্থান বিশেষ ছিলনা। তাঁর ছবি ক্রমশ কোণঠাসা হয়ে পড়ছিল। নিজের স্টুডিওকে থিয়েটার বানিয়ে কিছুদিন চালাবার চেষ্টাও ব্যর্থ হয়ে যায়। ১৯২৩ সালে তাঁর সৃষ্টি—সমস্ত ছবির নেগেটিভ তিনি বিক্রি করে দিতে বাধ্য হন। সুসংরক্ষণের অভাবে তাঁর তৈরী হাজারখানা ছবির মধ্যে মাত্র পঞ্চাশখানা আজ অবশিষ্ট। মেলিস কোথায় হারিয়ে যান। ১৯২৯ সালে এক সাংবাদিক প্যারিসের রেলওয়ে স্টেশনে মেলিসকে আবিষ্কার করেন খেলনা আর লজেন্সের ফেরিওয়ালারূপে। ১৯৩৮ সালে মেলিসের মৃত্যু হয়, Edwin S. Porter-এর মৃত্যুর ঠিক তিনবছর আগে যারও শেষ জীবন কেটেছিল কারখানার সামান্য শ্রমিক হিসেবে।

চলচ্চিত্রের প্রয়োগবিদ্যার আঙ্গিকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা থেমে রইল না। ইংল্যাণ্ডের চলচ্চিত্রকার স্মিথ (George Albert Smith : 1864-1959) ১৮৯৭ সালে ডাবল এক্সপোজারের (Double exposure) পেটেণ্ট নিলেন। যার ব্যবহার আমরা দেখতে পেলাম 'The Corsican Brothers' (1897), 'The Fairy Grandmother' (1898), 'Faust and Mephistopheles' (1898) ইত্যাদি ছবিতে। এই স্মিথই প্রথম Extreme Close-up-এর ব্যবহার করলেন তাঁর মজার ছবি Grandma's Reading Glass (1900)-এ। ১৯০০ সালে স্মিথ, আরবানের (Charles Urban) Warwick Trading Co.-তে যোগদান করলেন। এই আরবানের সাথেই যুগ্মভাবে ১৯০৬ সালে পেটেণ্ট গ্রহণ করেছিলেন 'Kinemacolour' রঙ্গীন প্রতিচ্ছবি গ্রহণ পদ্ধতির।

১৯০১ সালে এল' তেপায়াতে (Tripod) ক্যামেরা লাগাবার এবং হ্যাণ্ডেলের সাহায্যে দিক পরিবর্তনের ব্যবস্থা। যার সাহায্যে নেওয়া ছবিকে আমরা Panaromic বা Pan Shot বলে থাকি। ম্যাজিক লণ্ঠনকে আগু-পিছু করে ছায়ামূর্তি বড়-ছোট করার প্রচলন বহুদিন আগে থাকতেই ছিল। ক্যামেরার ক্ষেত্রে এর প্রথম ব্যবহার (Tracking Shot) করেছিলেন মেলিস তাঁর L' Homme a la tete de Caoutchouc ছবিতে।*

বিদেশে মূলত ইউরোপের বিভিন্ন দেশগুলোতে ইংরাজী এবং ফরাসী ছবির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় ওয়েবস্টারের নিয়ন্ত্রণাধীন ভিটাস্কোপ কোনরকম সাফল্য লাভ করতে পারল না। র‍্যাফ গ্যামন কোম্পানীর প্রতিনিধি ওয়েবস্টার লণ্ডন ছেড়ে নিজের দেশ অ্যামেরিকায় ফিরে গেলেন ১৮৯৬ সালে। ফিরে এসেও চলচ্চিত্র থেকে মুক্তি পেলেন না। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এত প্রোজেক্টর ও ফিল্মের চাহিদা দেখে নিজে নিজেই একটা ব্যবসার চেষ্টা করতে লাগলেন। প্রাক্তন এডিসনকর্মী

---

* মতান্তরে ইংল্যাণ্ডের উইলিয়ামসন (James A. Williamson : 1855-1933) তাঁর নির্মিত 'The Big Swallow' (1901) ছবিতে প্রথম Tracking Shot ব্যবহার করেন।

কানের (Edward Kuhn-এনার স্ত্রী কিনেটোস্কোপের ছবি Annabelle, the Dancer হাতে রঙ করেন যেটা ছিল চলচ্চিত্রকে রঙীন করার প্রথম প্রচেষ্টা) সাথে আলাপ হ'ল ওয়েবস্টারের। দু'জনে মিলে তৈরী করলেন 'International Film Co.', তাঁদের তৈরি যন্ত্রের নাম হ'ল 'International Projectorscope'।

সমসময়ে এক বিরাট ঘটনা ঘ'টল চলচ্চিত্রের ইতিহাসে। অ্যামেরিকার এক ফিল্ম ল্যাবরেটরিতে হঠাৎই বেরিয়ে গেল ফিল্ম নকল করার পদ্ধতি। ফিল্মের পরিভাষায় একে বলা হ'ল 'Duping' বা 'Contra-type Print'। এখন থেকে একই ছবির অনেকগুলো প্রতিলিপি বিভিন্ন জায়গায় একসাথে দেখানোর সুবিধে হ'ল। অসুবিধে হ'ল বিদেশী ছবি-গুলোর। রাতারাতি নকল হ'য়ে সারা দেশময় ছড়িয়ে পড়ল। ব্যবসার দিক থেকে তা বিশেষ ক্ষতিকর ছিল।

১৮৯৬ সালের শেষ দিকটা ছিল চূড়ান্ত উত্তেজনাময়। চলচ্চিত্রের প্রযুক্তিবিদ্যায় দিনে দিনে বিভিন্ন ঘটনা ঘ'টতে থাকে। অখ্যাত বহু লোক এই ব্যবসায় এসে হঠাৎ নাম করে ফেলতে শুরু করলেন। অবশ্য প্রায় রাতারাতি পতন ঘটার সংখ্যাও নিতান্ত কম ছিল না।

ডিকসনকে আমরা শেষ দেখেছিলাম এডিসন কোম্পানী ছেড়ে ল্যাথামদের সাথে যোগ দিতে এবং তারপর ল্যাথামদের ছেড়ে K.M.C.D. Syndicate-এ যোগ দিতে। আইনগত ব্যাপারে জড়িয়ে পড়ার ভয়ে ক্যাসলার তাদের কাজ বিশেষ গোপন রাখছিলেন। সুতরাং ঠিক কোন সময়ে নিউইয়র্কের কানাস্টোটায় (Canastota) তাদের নতুন প্রোজেক্টর তৈরি হয়েছিল তা বলা যায় না। তবে এই ঘটনা চলচ্চিত্রের ইতিহাসে ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই সংস্থা থেকেই তৈরি হয় 'Biograph Company' যার সাথে পরবর্তীকালে জড়িত হয়েছিল গ্রীফিথ, ম্যাক্সেনেট, মারি পিকফোর্ড, ব্যালান্স সুইট ইত্যাদির মত তারকাদের নাম।

কে. এম. সি. ডির যন্ত্র 'The American Biograph' নাম নিয়ে আত্মপ্রকাশ করল বুধবার ১২ই অক্টোবর, ১৮৯৬ সালে Hammerstein's Olympia Music Hall-এ। পরের দিনের কাগজে (New York Tribune এবং অন্যান্য) উচ্ছ্বসিত প্রশংসা প্রকাশিত হ'ল। সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয় হ'ল ডিকসনের তোলা 'The Empire State Express'।

নিউইয়র্ক থেকে বাফেলোর মধ্যে যাতায়াতকারী এই দ্রুতগামী ট্রেনের আক্রমণাত্মক close-up আর তার সাথে যথাযথ তীব্র বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার দর্শকদের ভীষণ মুগ্ধ করল। প্রদর্শিত ছবির গুণগত মান ছিল এযাবৎ দেখানো সমস্ত ছবির মধ্যে সেরা। প্রত্যেকটি ফ্রেমের আয়তন ছিল এডিসনের মাপের প্রায় আটগুণ বড়। এছাড়া এডিসনের যন্ত্রের পেটেন্ট এড়ানোর জন্য প্রোজেক্টরের যান্ত্রিক পদ্ধতিও ছিল ভিন্ন ধরণের।

বায়োগ্রাফ ব্যবসার ক্ষেত্রেও নতুন ধরণের পদ্ধতি অবলম্বন করেছিল। এদের যন্ত্র কেনা বা লিজ নেওয়া যেত না। প্রত্যেকটি প্রদর্শনীর জন্য ফিল্ম, মেশিন এবং চালক ভাড়া করতে হ'ত।

বায়োগ্রাফ, ইস্টম্যান কোম্পানীর সবচেয়ে বড় ক্রেতা হয়ে দাঁড়াল। সেকেণ্ডে ৩৬ খানা বৃহৎ মাপের ফিল্মের ব্যবহার প্রায় ২০ গুণ কাঁচা-মালের খরচ বাড়িয়ে দিয়েছিল।

Mutoscope Peep Show এবং বায়োগ্রাফ কোম্পানী উভয়ের প্রয়োজনীয় ছবি তোলার জন্য Hackett-Carhart Building-এর ছাদের উপর তৈরী হ'ল স্টুডিও। এই সময় বায়োগ্রাফ সত্যি চমৎকার একটা কাজ করল। তখন ব্রডওয়েতে 'Star Theatre'-এর বাড়ি ভেঙে ফেলার কাজ চলছিল। বাড়ি ভাঙার কাজ শুরু হওয়ার সময়, যেখান থেকে পুরো দৃশ্যটা ধরা পড়ে এমন একটা ভাল জায়গায় একটা ক্যামেরা বসিয়ে দেওয়া হ'ল। ক্যামেরাটা ছিল স্বয়ংক্রিয়। প্রতি ৩০ মিনিট অন্তর ছবি উঠতে লাগলো যতদিন না বাড়ি ভাঙার কাজ শেষ হ'ল। স্বাভাবিক গতিতে পর্দায় এই ছবির প্রতিক্রিয়া হ'ল অদ্ভুত। মনে হ'ল মস্ত বড় বাড়িটা কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই ভেঙে শূন্যে মিলিয়ে গেল। এর পরে বায়োগ্রাফ তুলেছিল নিউইয়র্কের তৎকালীন পুলিশ কমিশনার Theodore Roosevelt-এর ওপরে তথ্যচিত্র।

বায়োগ্রাফ দেশের গণ্ডী পার হ'ল এবং ইউরোপের প্রধান প্রধান শহরগুলোতে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হ'ল। ডিকসন ফিরে গেলেন নিজের দেশ ইংল্যাণ্ডে। যদিও পরে তিনি ফ্রান্সে আসেন। লস্ট যিনি ডিকসনের সহকারী ছিলেন সেই এডিসনের আমল থেকেই এবং ডিকসনের সাথে সাথেই সমস্ত জায়গা ঘুরেছিলেন তিনি গেলেন কোম্পানীরই কাজে ফ্রান্সে।

এই সময়েই বিজার (Willam Bitzer : 1874-1944) যিনি পরবর্তীকালে বিলি বিজার নামে গ্রীফিথের ক্যামেরাম্যান হিসেবে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন, বায়োগ্রাফ কোম্পানীতে যোগ দিলেন একজন ইলেকট্রিক্ কারিগর হিসেবে।

সমসময়ে এডিসনের পক্ষ থেকেও নতুন প্রোজেক্টর 'Projecting Kinetoscope' বাজারে ছাড়া হ'ল। এরই তেরো নম্বর প্রোজেক্টরটা পেলেন ব্ল্যাকটন (J. Stuart Blackton, 1875-1941) নামে এক ব্যঙ্গ চিত্রশিল্পী। বেশ কিছুদিন আগে এডিসনের এক সাক্ষাৎকার নেওয়ার সময়, তিনি এডিসনের সঙ্গে ঘনিষ্ট হন। ব্ল্যাকটন তাঁর সাথী হিসেবে পেলেন স্মিথকে (Albert E. Smith)। ১৮৯৬ সালের নভেম্বর তাঁদের প্রদর্শনী শুরু হ'ল, Sea Waves at Coney Island, Blackton : The Evening World Cartoonist (এই ছবিটা এডিসনের সাক্ষাৎকার নেওয়ার সময় Black Maria Studio-তে তোলা হয়েছিল), The Bad Boy and the Garden Hose, Shooting the Shutes এবং Fire Engines Responding to an Alarm ইত্যাদি ছবি নিয়ে। এইসব ছবি পাওয়া গিয়েছিল এডিসনের কাছ থেকে।

মনে-প্রাণে শিল্পী ব্ল্যাকটনের কেনা ছবিতে ঠিক মন ভরছিল না। তাছাড়া ছবির যোগানও প্রচুর না থাকায় নিজেই ছবি তৈরী করতে উৎসাহী হয়ে উঠলেন। স্মিথের প্রচেষ্টায় খুব দ্রুতই একদিন কিনেটোস্কোপ প্রজেক্টরকে একটু অদল বদল করে একটা ক্যামেরা তৈরি হয়ে গেল। প্রথম কয়েকদিন এদিক ওদিক ছবি তুলে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে সন্তুষ্ট হলেন ব্ল্যাকটন। ছবির মধ্য দিয়ে কীভাবে একটা গল্প বলা যায় এই ভাবনা তার মাথায় হঠাৎ এলো। এর জন্য তৈরি হ'ল স্টুডিও 140, Nassau Street-এ Morse Building-এর ছাদে যেখানে প্রচুর আলো। স্মিথ রইলেন ক্যামেরার পিছনে আর ব্ল্যাকটন সামনে। তৈরি হ'ল 'The Burglar on the Roof' ১৮৯৭ সালে। ব্ল্যাকটন ছাড়া অফিসের বাচ্চা বেয়ারা, পরিচারিকা সবাই অভিনয় করলেন টিফিনের অবসর সময়ে। ছবির দৈর্ঘ্য হ'ল আজকালকার ছবিতে পরিচয়লিপি পড়তে যেটুকু সময় লাগে প্রায় সেইরকম। মূলযন্ত্র ভিটাস্কোপকে মনে রেখে তাঁরা তাঁদের উদ্ভাবিত যন্ত্রের নাম রাখলেন ভিটাগ্রাফ (vitagraph)।

এডিসনের ক্যামেরা

আরমাট-জেনকিনসের ক্যামেরা

পাথে ক্যামেরা

জর্জ মেলিস

বার্ট এক্যারের ক্যামেরা
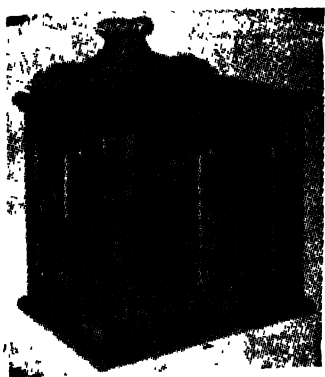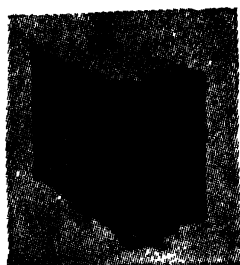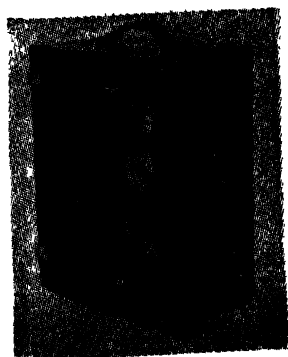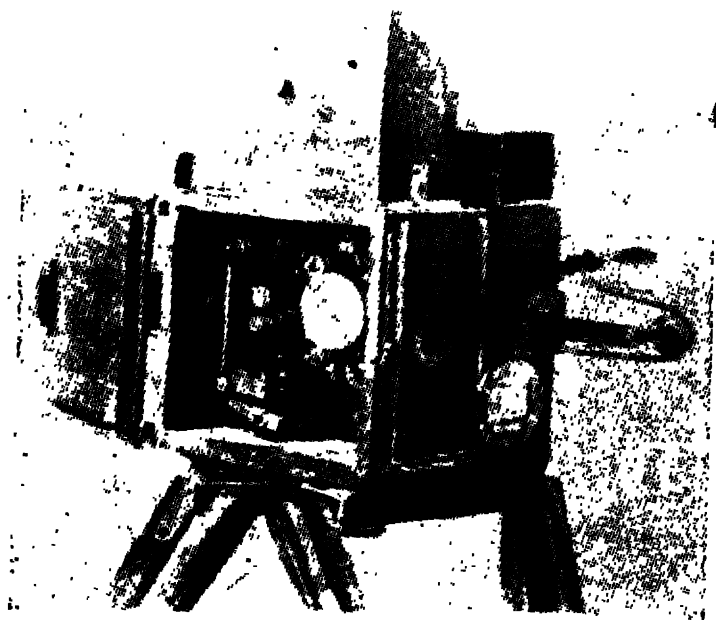
থিয়েট্রোগ্রাফ

১৮৯৬ সালের শেষ দিকে অ্যামেরিকান নৌবাহিনীর কাজ শেষ করে মাটিতে পা রাখলেন বিদ্যুৎকর্মী পোর্টার (Edwin S. Porter, 1869-1941) র‍্যাফ গ্যামন কোম্পানীতে তাঁর কাজ পেতে কোন অসুবিধা হ'লনা। এই সংস্থা তখন ভিটাস্কোপে ছবি দেখাতেন নিউইয়র্ক শহরে। পোর্টার বুদ্ধিমান লোক ছিলেন। কিছুদিন কাজ করতে করতে এটুকু বুঝতে পারলেন যে ক্রমশ চলচ্চিত্র প্রচণ্ড প্রতিযোগিতাময় ব্যবসা হয়ে উঠতে চলেছে। ভিটাস্কোপের একাধিপত্য বেশিদিন থাকতে পারে না। ঠিক এই সময় তাঁর সাথে আলাপ হ'ল ড্যানিয়েল (Harry Daniels) নামে এক ভদ্রলোকের। ড্যানিয়েল আদৌ চলচ্চিত্রের সঙ্গে জড়িত ছিলেন না। তবু দুজনে মিলে একটা প্রজেক্টরস্কোপ কিনে ফেললেন ইণ্টারন্যাশনাল ফিল্ম কোম্পানীর কাছ থেকে।

ব্যবসার জন্য পাড়ি দিলেন অনেক দূরে। জ্যামাইকাতে হ'ল তাঁদের প্রথম প্রদর্শনী। কোস্টারিকার (Costarica) রাজধানী সান্ জোসে (San Jose) তাদের প্রদর্শনী অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করল। সবচেয়ে বেশী কদর পেল অ্যানাবেলের "Butterfly Dance"। এই সমস্ত সফরে পোর্টার নাম নিয়েছিলেন 'Mr. Thomas A. Edison Jr'।

বছর খানেক বাদে পোর্টার ফিরে এলেন। পশ্চিমভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে রেখে এলেন 'এডিসন জুনিয়র' নামটাও। দেশে ফিরে এসেই পোর্টার পেলেন একটা নতুন ধরনের কাজ। যাদের কাছ থেকে প্রজেক্টরস্কোপ কিনেছিলেন সেই Kuhn & Webster Company (ইণ্টারন্যাশনাল ফিল্ম কোম্পানীর আগের নাম) তখন বিশ্বের প্রথম বিজ্ঞাপন চিত্র তৈরী করার কাজে ব্যস্ত। এই ছবির চিন্তা প্রথম যার মাথায় আসে তাঁর নাম আজ ইতিহাস ঘেঁটে খুঁজে পাওয়া যায় না। বাস্তবিকই বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য ছিল তাঁর নাম। পোর্টার এই কাজে নিয়োজিত হ'লেন। তৈরি হ'ল 'Haig & Haig highland Whisky' আর Maillard's Chocolate।

•

রাতের অন্ধকার নেমে আসা মাত্রই পোর্টার Pepper Building-এর ছাদের ওপরে একটা কোণে বিজ্ঞাপনের ছবিগুলো দেখাতেন। সঙ্গে চলতি খবরও মাঝে মাঝে জুড়ে দেওয়া হ'ত। পর্দার পিছনে থাকতো প্রজেক্টর। ব্রডওয়ের রাস্তা জুড়ে জমে যেত ভীড়। রাস্তায় জটলা হয়ে যেত গাড়ির। খুব সুবিধে হ'ত পকেটমারদেরও। ব্যাপারটা চমকপ্রদ হলেও অন্যান্য চলচ্চিত্র প্রদর্শকরা এটাকে খুব ভালো চোখে দেখলেন না। তাঁরা পুলিশে খবর দিলেন। একদিন প্রদর্শনী চলাকালীন অবস্থায় পোর্টার গ্রেপ্তার হ'লেন ট্রাফিক-আইন ভঙ্গের দায়ে। এরপর পোর্টার চলে গেলেন কানাডায়। সঙ্গে নিয়ে গেলেন লুমিয়েরদের কাছ থেকে কেনা রাণী ভিক্টোরিয়ার পঞ্চাশ বছর পূর্তী উৎসবের ছবি।

নিউইয়র্কে ফিরে আসার পর পোর্টার যোগ দিলেন বিখ্যাত Eden Musee Hall-এর বিডনেলের (William L. Beadnell) সাথে। এরা চেষ্টা করতে লাগলেন এমন সব ছবি প্রদর্শনের যা অন্য কোথাও দেখানো সম্ভব হবে না। Eden Musee'র মালিক হোলামান (Rich G. Hollaman) এ ব্যাপারে উঠে পড়ে লাগলেন। অ্যামেরিকায় পাওয়া যায় এমন ছবি ছাড়াও মেলিস, লুমিয়ের, ইংল্যাণ্ডের পল এবং প্যারিসের পাথের কাছ থেকে ফিল্ম কিনে নিতে থাকলেন। শুধু তাই নয় ক্যানক (Frank Cannock) নামে এক দক্ষ কর্মীকে দিয়ে প্রজেক্টরের উন্নতির চেষ্টাও করতে থাকলেন।

এইভাবে প্রভুত পরিমাণে ফিল্মের প্রয়োজন হচ্ছিল এই কারণে যে হোলামান চাইছিলেন খুব তাড়াতাড়ি যাতে ছবি পাল্টে দেখানো যায়। এতে করে দর্শকদের উৎসাহ ঝিমিয়ে পড়ার সম্ভাবনা কম। এ ব্যাপারটা আরেকজনেরও চোখে পড়েছিল। তিনি হলেন রক (William T. Rock)। রক ভিটাস্কোপ দেখাতেন নিউ অরলিয়ন্সে। নিউইয়র্কে যাওয়া আসার সময়ে Eden Musee'র এই ব্যাপারটা তিনি লক্ষ্য করলেন। রক পোর্টারের সাথে ভাব জমিয়ে কিছু ছবি দেওয়া নেওয়ার ব্যাপারে চেষ্টা করতে লাগলেন যাতে উভয় পক্ষেরই সুবিধে হয়। যদিও টাকা-পয়সার ব্যাপারটা এর মধ্যে ছিল না তবু ইতিহাস বলে যে এইভাবেই সূত্রপাত হয়েছিল ফিল্ম-পরিবেশন ব্যবসার (distribution)।

এদিকে যান্ত্রিক উন্নতির জন্য কিছু কিছু লোক তখনও ভাবনা-চিন্তা করে চলেছিলেন। তাঁদের মধ্যে অন্যতম ব্যক্তি হ'লেন অ্যামেরিকান ভিটাগ্রাফের স্মিথ। আজকে সিনেমা দেখতে দেখতে আমরা যখন ছবি সঠিক ভাবে পর্দায় দেখতে পাইনা (miss frame) তা হয় প্রজেক্টর চালকের অবহেলার দরুণ। কিন্তু তখনকার দিনে সেটা হামেশাই ঘ'টত যন্ত্রের দোষে এবং সময়ে সময়ে ছবি বন্ধ করে আবার ঠিক করে ফিল্ম চালাতে হ'ত। স্মিথ এ ব্যাপারটা নিয়ে চিন্তা করতে করতে বার করে ফেললেন এক ধরণের চলমান ফ্রেম ঠিক করার উপায় (movable framing aperture)। যদিও এর নকল হয়ে বাজারে ছড়িয়ে পড়তে বেশি সময় লাগলো না। এর তিন বছরের মধ্যেই একদিন ট্রেনে করে নিউইয়র্ক ফেরার পথে তিনি নিউজার্সির প্রাকৃতিক শোভা মুগ্ধ হয়ে দেখছিলেন জানালা দিয়ে। কিন্তু ট্রেনের গতি কমে আসতেই তাঁর দৃষ্টিপথে বারবার বাধা দিতে লাগলো টেলিগ্রাফের পোষ্টগুলো। একই অসুবিধাতো (flickering) বোধ করেন তিনি ছবি প্রক্ষেপণের ক্ষেত্রেও। ট্রেনের গতি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দেখার এই অসুবিধা আবার কমে যেতে থাকল। এই ভাবেই জন্ম নিল তখনকার দিনের প্রজেক্টরে একটা শাটারের বদলে অনেকগুলো শাটারের ব্যবহার যা ছবির কম্পনকে অনেকাংশে কমিয়ে দিতে পেরেছিল।

চলচ্চিত্র পর্দায় আসার পর যখন সবেমাত্র দু'বছর কেটেছে, তখন এক ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘ'টল।

সাঁসেলিসের (champs Elysees) কাছেই ব'সত প্যারিসের সম্ভ্রান্ত পরিবারদের দ্বারা আয়োজিত Societe Charite Maternelle-এর বাৎসরিক মেলা। ১৮৯৭ সালের ৪ঠা মে, বিকেল চারটে নাগাদ যখন মেলার ভীড় উপচে পড়ছে, তখন হঠাৎ নজরে প'ড়ল তাঁবুর একদিকে আগুন ধরে গেছে। ভয়ে আতঙ্কে লোকজন ছোটাছুটি শুরু করে দিল। ভীড়ের চাপে বহু লোক ছিটকে পড়ল মাটিতে। ভীড় তাদের মাড়িয়েই ছুটে চলল নিরাপদ দূরত্বের দিকে। এইভাবেই শুরু হয়েছিল কুখ্যাত Charity Bazar Fire। মাত্র একঘণ্টা মত, স্থায়ী এই অগ্নিকাণ্ডে সুন্দর রঙীন মেলা রূপান্তরিত হয়েছিল এক বীভৎস শ্মশানে। ফ্রান্সের গণ্যমান্য একশ' ত্রিশ জনকে নিয়ে মৃতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল একশ' আশীতে।

কিছুদিন বাদে সরকারীভাবে এই দুর্ঘটনার তদন্ত শুরু হ'ল। M. Lepine নামে এক ভদ্রলোক নিযুক্ত হ'লেন এই কাজে। ১০ই মে ১৮৯৭, Municipal Council of Paris-এর বিবৃতি থেকে দেখা গেল দুর্ঘটনার পেছনে চলচ্চিত্রের ভূমিকা রয়েছে। ১৩ই মে, পুলিশ কর্তৃপক্ষ সমস্ত চলচ্চিত্রের যন্ত্রপাতির বিবরণ সংগ্রহ করতে শুরু করলেন এবং ১৫ই মে এই ঘটনার পেছনে আসল ব্যাপারটা জানতে পারা গেল M. Bellac নামে এক সিনেমাটোগ্রাফ যন্ত্রের কর্মীর জবানবন্দী থেকে। বেলাক চ্যারিটি বাজারে সিনেমাটোগ্রাফ দেখাচ্ছিলেন। ল্যাম্পের আলোটা কমে যাচ্ছে মনে হওয়ায় তিনি একটা দেশলাই জ্বেলে ভাল করে দেখতে গেলেন আর তাতেই হ'ল বিপত্তি। ল্যাম্পের ইথার বাষ্পে লেগে গেল আগুন যা ছড়িয়ে পড়তে বিন্দুমাত্র দেরি হ'লনা। ২৪শে মে, একই ধরণের আর একটা আগুন লাগার খবর পাওয়া গেল। তবে তাতে কেউ আহত হয়নি।

যদিও এই ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের জন্য অসাবধানতাই বিশেষভাবে দায়ী, তবু বদনাম হ'ল চলচ্চিত্রের। চলচ্চিত্র এক ভীষণ বিপজ্জনক ব্যাপার একরকম একটা ধারণা তৈরি হ'ল। শুধু ইউরোপে নয়, অ্যামেরিকাতেও চলচ্চিত্র সংক্রান্ত জিনিসপত্রের বহন ইত্যাদির ওপর আইনের বিধি নিষেধ আরোপিত হ'ল। সবচেয়ে বড়কথা জনপ্রিয়তা রাতারাতি ভীষণ কমে গেল। এই অবস্থা কাটিয়ে উঠতে চলচ্চিত্রের বহুদিন সময় লেগেছিল।

১৮৯৭ সালে ঘটনাচক্রে আরবান (Charles Urban) নামে এক বই-ব্যবসায়ী এসে পড়লেন চলচ্চিত্রের জগতে। থোমে (R. Z. Thomae) তখন Michigan Electric Company'র অধিকর্তা। এর আগে তিনি Raff & Gammon আর Kinetoscope Companyতেও কাজ করেছিলেন। Michigan Electric Company আবার কিছুদিন বাদে North American Phonograph Company-র সাথে এক হয়ে গেল। যাই হোক এখানে এসে আরবান Phonograph বিক্রির কাজে থোমেকে সহায়তা করতে শুরু করলেন। এডিসনের তৈরী ডিকটেশন মেশিন এই সময়ে বাজারে এসে গেল। আরবান কানাডায় চলে গেলেন এই মেশিনের বিক্রির ব্যাপারে। কানাডায় প্রচণ্ড সাফল্য লাভ করল এই যন্ত্র। আর-বানেরও বেশ নাম-ডাক হ'ল।

এর কিছুদিন বাদে তাঁদের কোম্পানীতে কেনা হ'ল এডিসনের Peep Show Kinetoscope। স্বভাবতই আরবানের মত উদ্যমী ব্যক্তি এতে বিশেষ উৎসাহী হয়ে উঠলেন। ভিটাস্কোপ আর সিনেমাটোগ্রাফের ছবি কেমন হচ্ছে তা দেখার জন্য নিউইয়র্কেও ছুটে গেলেন। ডেট্রয়টে ফিরে এসে তিনি এডিসনের Projecting Kinetoscope এর এজেন্সি নিয়ে নিলেন। প্রজেক্টর আর ফিল্মের ব্যবসার জন্য আরবান উঠে পড়ে লাগলেও কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর ব্যবসায় মন্দা দেখা দিল। মিচিগানে তখন মাত্র কয়েকটি জায়গাতেই বিদ্যুৎ গিয়ে পেঁাচেছে। ফলে বিদ্যুৎশক্তি নির্ভর এডিসনের কিনেটোস্কোপ বেশীদূর নিজেকে ছড়িয়ে দিতে সমর্থ হ'ল না।

আরবান বিপদে পড়লেও বুদ্ধি হারালেন না। কিনেটোস্কোপ যাতে হাতে চালান যায় এবং কৃত্রিম আলোয় দেখান যায় এর জন্য চেষ্টা করতে লাগলেন। নিউইয়র্কে এসে পুরোনো বন্ধু আইসাকের (Walter Issacs) সাথে যোগাযোগ করলেন। দু'জনে মিলে তৈরী করে ফেললেন তাঁদের প্রয়োজনীয় প্রজেক্টর যেটা আরো বেশি কার্যকরী হ'ল যখন তাঁরা ফিল্ম জুড়ে (fish glue ব্যবহার হয়েছিল) এডিসনের জটিল ফিল্ম চালানোর

পদ্ধতিকে বাদ দিয়ে নতুন ধরণে এককালীন হাজার ফুট অবধি ফিল্ম দেখানর ব্যবস্থা করে ফেললেন। এর একবছর আগে ল্যাথামরাও ঠিক এই জিনিসই করতে পেরেছিলেন। যাইহোক এই নতুন যন্ত্রের নাম হ'ল 'Urban Bioscope'।

বায়োস্কোপ দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে। দূর দূরান্তরের মানুষ যাদের পক্ষে কোনদিনও শহরে এসে ফিল্ম দেখার সুযোগ হ'ত না তারা মাঠে মাঠে দেখতে পেল এডিসনের তোলা ফিল্ম বায়োস্কোপের মাধ্যমে।

এদিকে আরবানের অসামান্য ব্যবসায়িক বুদ্ধির পরিচয় পেয়ে Maguire & Baucus Company তাদের লণ্ডন অফিসের দায়িত্ব গ্রহণের জন্য আরবানকে অনুরোধ জানাল। তিনি এই সুযোগ হাতছাড়া করলেন না। সম্মানটা নেহাত কম ছিল না। লণ্ডনে এসে ব্যাকাস কোম্পানীর ব্যবসা মন্দার কারণটা বুঝতে তাঁর বিন্দুমাত্র দেরী হ'লনা। ব্যবসার তীব্র প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়ার অন্যতম কারণ ছিল ব্যাকাস কোম্পানীর নামটা। ছবির মানের চেয়ে দর্শকদের আকর্ষণটা ছিল স্বদেশী নামের প্রতি। আরবান রাতারাতি এই কোম্পানীর নাম পালটে একটা ব্রিটিশ নাম আর ঠিকানা করে ফেললেন। ব্যাকাস কোম্পানীর নাম ঠিকানা হ'ল Warwick Trading Company, Warwick Court, High Holborn। এখানে বসে আরবান তৈরী করলেন Warwick ক্যামেরা। ব্রিটেনে চাই ব্রিটিশ জীবনের ছবি তাই তৈরী হ'ল ব্রিটিশ নৌবাহিনীর উপর ছবি। সম্পাদিত দৈর্ঘ্য বারশ' ফুটের 'Rule Britannia' প্রচণ্ড জনপ্রিয়তা পেল। ১৮৯৮ সালে ওয়ারউইক কোম্পানী নিজেকে অন্যতম প্রধান চলচ্চিত্র ব্যবসায়ী হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হ'ল।

হেপওয়ার্থ (Cecil Hepworth ; 1874-1953) এই সময়ে ওয়ার-উইকে যোগদান করলেন। এর আগে তাঁর সাথে চলচ্চিত্র জগতের যোগাযোগ ছিল, পলের থিয়েটারোগ্রাফের জন্য আলো (arc lamp) সরবরাহকারী হিসেবে। ওয়ারউইকে এসেই হেপওয়ার্থ একটা বিরাট কাজ করে ফেললেন। তিনি তৈরী করলেন Film developing machine। হাতে করে ফিল্ম ধোয়ার বিরাট পরিশ্রম লাঘব হ'ল এবং সময়ও বিস্তর বেঁচে গেল এবার থেকে।

ফিল্মের বয়স যখন তিন এবং পর্দার দুই, তখন এল Passion Play। লুমিয়েরদের অ্যামেরিকার প্রতিনিধি হার্ড (W. B. Hard) 'Eden Musee'র প্রেসিডেণ্ট হোলামানের সাথে এ-ব্যাপারে কথা বললেন। মোরসের (Salmi Morse) লেখা নাটকের স্ক্রিপ্টই হ'ল পৃথিবীর প্রথম চিত্রনাট্য। Lexinton Avenue'র Grand Central Palace-এর ছাদে তৈরী হ'ল 'Passion Play'র জন্য স্টুডিও। প্যালি (William C. Paley) নামে এক ইংরেজ ভদ্রলোক হোলামানের অনুরোধে তৈরী করলেন একটু ভিন্ন ধরণের ক্যামেরা যাতে করে এডিসন আবার মাঝপথে বাধা না দিতে পারেন। এমনকি ফিল্মও কেনা হয়েছিল লুমিয়েরদের কাছ থেকে পাছে ইস্টম্যানদের কাছ থেকে খবরটা আবার এডিসন অবধি চলে যায়। ভিনসেণ্ট (L. J. Vincent) নামে এক প্রতিষ্ঠিত নাট্য পরিচালক ডিসেম্বর মাসে 'Passion Play'র কাজ শুরু করে দিলেন এবং ১৮৯৭ সালের জানুয়ারী মাসের গোড়ার দিকে কাজ শেষ হয়ে গেল। ৩০শে জানুয়ারী Eden Musee হলে বিকেল তিনটে আর রাত ন'টায় ছবি দেখানোর ব্যবস্থা করা হ'ল। তখনও চলচ্চিত্রে লেখা ফেলার (Sub Title) ব্যবস্থা হয়নি, তাই মুখে বলে দেওয়া হ'ত গল্পের ধারাবাহিকতা। Frank Oakes Rose ছিলেন প্রায় ২১০০ ফুট 'Passion Play'র ধারাভাষ্যকার। 'Passion Play' প্রচণ্ড জনপ্রিয়তা পেল সবার কাছ থেকে। সবাই খুশী হলেন— দর্শক এবং নির্মাতারা উভয়েই।

কিন্তু রচয়িতা মোরসের জন্য বিধাতা কিছুই দিলেন না। দিলেন না অ্যাবেকেও (Henry E. Abbey)। মোরসের সারাজীবনের স্বপ্ন ছিল Passion Play। বহু ঘাত প্রতিঘাত অসম্ভব দুঃখ কষ্টের জীবনের মধ্যে একটু নির্মল আলোর মত ছিল এই নাটক। জীবনের প্রায় শেষ দিকে এসে তিনি অ্যাবেকেও পেয়েছিলেন যিনি যোগ্য উৎসাহ আর মর্যাদা দিয়ে নাটকটাকে মঞ্চস্থ করার চেষ্টা করেন। অ্যাবে তাঁর জীবনের সমস্ত সঞ্চয় এবং উৎসাহ বিনিয়োগ করেছিলেন এই প্রকল্পের পিছনে। তখনকার দিনে প্রায় ৪০০০০ ডলার খরচ করেছিলেন। পুরনো চার্চ লীজ নিয়ে

স্টেজ বানিয়ে এবং তখনকার সবচেয়ে বিখ্যাত পোষাক-বিশেষজ্ঞ Albert G. Eaves কে এই প্রকল্পে নিয়োগ করেছিলেন যাতে প্রয়োগশৈলীতে কোন খুঁত না থাকে। পুরনো জেরুজালেমের দৃশ্য নিখুঁত করার জন্য বিরাট স্টেজে তিনি জীবন্ত উট-ভেঁড়া পর্যন্ত ব্যবহার করেছিলেন চূড়ান্ত মহড়ার সময়। অ্যামেরিকার থিয়েটারের ইতিহাসে এটাই ছিল তখনো পর্যন্ত সবচেয়ে কঠিন এবং দুঃসাহসিক পরিকল্পনা।

নাটক শুরুর দিন পর্যন্ত ঘোষণা করা হয়ে গেল। সেটা ছিল ১৮৮০-'৮১ সাল। মোরসের জীবনের প্রায় শেষ প্রান্তে এসে সচ্ছলতা আর সম্মানের মুখ বোধহয় দেখতে পাবেন, এমন সময় ধর্মীয় কারণে নিউইয়র্কের মেয়র প্রদর্শনী বন্ধ করে দিলেন। মোরসের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। অ্যাবে শেষ চেষ্টা চালিয়েও কিছু করতে পারলেন না।

মোরসে পুরনো জীবনে আবার ফিরে এলেন। জীবিকার জন্য শুরু হ'ল আবার সংগ্রাম। ব্যর্থ, রিক্ত, নিঃস্ব মোরসের জীবনের শেষ আলো-টুকুও নিবে গেল। কয়েকটা বছর পার হ'ল এইভাবে। মোরসে হারিয়ে গেলেন। এরপর প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় এক শীতের সকালে পুলিশ নর্থ রিভার থেকে উদ্ধার করেছিল মোরসের মৃতদেহ।

অ্যাবে আরো কয়েকটা বছর ধরে মামলা-মোকদ্দমা করে দাঁড়াবার ব্যর্থ চেষ্টা করে অবশেষে ১৮৯৬ সালের অক্টোবর মাসে মারা গেলেন—'Passion Play' বাস্তবে রূপায়িত হবার ঠিক একবছর আগে।

১৮৯৭ সালে অ্যামেরিকার সাথে স্পেনের যুদ্ধ শুরু হ'ল। স্বাভাবিক ভাবেই এর প্রভাব চলচ্চিত্রেও দেখা গেল। ব্ল্যাকটন এবং স্মিথ তুলে ফেললেন 'Tearing Down The Spanish Flag'। প্রচণ্ড জনপ্রিয়তা পেয়েছিল এই ছবি।

ছবি তৈরীর বড় জায়গাতে অর্থাৎ শিকাগো, নিউইয়র্কেও দেশাত্মবোধক ছবি করার চেষ্টা চলতে লাগল। এডিসন, লুবিন, সেলিগ এবং আমেট সবাই লেগে পড়লেন এই কাজে। সৈন্যদের আসা যাওয়া 'মারণাস্ত্রের সমাবেশ ইত্যাদিরও ছবিও তোলা হতে থাকলো। কিছু ক্যামেরাম্যান (এদের মধ্যে 'Passion Play'র ক্যামেরাম্যানও ছিলেন) চলে গেলেন কিউবাতে সরাসরি যুদ্ধের ছবি তোলার জন্য। কিন্তু ক্যামেরা উপযুক্ত ছিলনা ; ছিল না লেন্সের কার্যকরী ক্ষমতার সাহায্যও। তাই প্রকৃত যুদ্ধের ছবি উঠল না।

এদিকে আউকেগানের স্টুডিওতে বসে আমেট (Edward H. Amet) এক বিস্ময়কর কাজ করে ফেললেন। স্টুডিওর ভেতরে জলের চৌবাচ্চায় আমেট তৈরী করে ফেললেন Bay of Santiago। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার ছবি অবলম্বনে অতি যত্নের সাথে নিখুঁতভাবে এবং লেন্সের দৃষ্টিকোণের সাথে সমতা রেখে তৈরী হ'ল সব যুদ্ধ জাহাজের মডেল। বৈদ্যুতিক-শক্তি-চালিত এইসব জাহাজ চালাতে তাঁকে সাহায্য করলেন William H. Howard আর ক্যামেরায় বসলেন আমেট নিজে। এইভাবে তিনি Admiral cervera-র নৌবাহিনীকে পরাস্ত করে চৌবাচ্চায় ডুবিয়ে দিলেন। আমেটের ছবি এত সুন্দর এবং বিশ্বাসযোগ্য হয়েছিল যে Lake Bluff—III U. S. Naval Training Station র কর্মকর্তাদেরও বোকা বানিয়ে দিয়েছিল। এর বেশ কিছুদিন পরে স্পেনে Madrid Military Archive-এ সংরক্ষিত হয়েছিল আমটের ছবি।

এরপরই আমেট তাঁর সমস্ত কিছু বিক্রি করে দিতে বাধ্য হন। তাঁর ক্যামেরা কিনে নিয়েছিলেন স্পুর, এ-ছাড়া অন্যান্য জিনিসপত্র চলে যায় Brown and Earle of Philadelphiaর হাতে। আমেট বাধ্য হয়ে চলচ্চিত্রের সাথে সব সম্পর্কছিন্ন করে বৈদ্যুতিক সাজসরঞ্জামের ব্যবসায় চলে যান।

মেলিসের গঠনধর্মী চিন্তা এবং কল্পনার বিস্তার ক্রমশঃ চলচ্চিত্রকে

দিচ্ছিল স্বাবলম্বন। চলচ্চিত্র শুধুমাত্র চলমান জিনিষের প্রতিচ্ছবি মাত্র নয়; Fade out, dissolve, double exposure ইত্যাদির মাধ্যমে এর নিজস্ব ভাষা সৃষ্টি হচ্ছিল। এই সব পদ্ধতিতে সমৃদ্ধ হয়ে তৈরী হ'ল 'A trip to the moon', 'Cinderella,' 'The kingdom of the fairies' ইত্যাদি ছবি।

প্রচণ্ড জনপ্রিয়তা হেতু, বিশেষতঃ অ্যামেরিকায় যথেষ্ট অন্যায় ব্যবসা শুরু হয়ে গেল। অনেক জনপ্রিয় ছবি নকল করে (dupe) ব্যবসায়ীরা নিজেদের ছবি বলে চালাতে থাকলেন। বাধ্য হয়ে মেলিস একদিন তাঁর ভাইকে (Gaston Melies) অ্যামেরিকায় পাঠিয়ে দিলেন। নিউইয়র্কে অফিস খুললেন তিনি (Star Films, 204 East, 38th Street)।

সমসময়ে পোর্টার যোগদান করলেন এডিসনের সংস্থায়। এখানে তাঁর প্রথম কাজ হ'ল Shamrock I-এ বিখ্যাত নৌকাদৌড় প্রতিযোগিতার ছবি তোলা। এ সময়ে একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটল। রেফারীর নৌকাতে আগে থাকতে অনেক প্রেস ফটোগ্রাফাররা উঠে বসেছিলেন। তাঁরা পোর্টারের বড়সড় মুভি ক্যামেরা নিয়ে ওঠাটা আদৌ পছন্দ করলেন না। ক্রমাগত অসুবিধা সৃষ্টি করতে থাকলেন যাতে পোর্টারের ছবি না ওঠে। বাধ্য হয়ে পোর্টার নৌকার একেবারে শেষদিকে চলে গেলেন যাতে করে কেউ তাঁর ক্যামেরার সামনে এসে দাঁড়াতে না পারে। শুরু হ'ল নৌকাদৌড়। সুন্দর পালতোলা নৌকার দল যাত্রা শুরু করল। পোর্টারও নির্বিঘ্নে ছবি তুলতে লাগলেন। কিন্তু এইদিকটা ছিল সূর্যের মুখোমুখি। ফটোগ্রাফারদের বিদ্রুপে যখন খেয়াল হ'ল ব্যাপারটা, পোর্টারের তখন আর কিছু করার নেই। লজ্জা এড়াতে তিনি ছবি তোলা বন্ধ করলেন না, যেন পুরো ব্যাপারটাই তার ইচ্ছাকৃত। প্রচণ্ড খারাপ মন নিয়ে পোর্টার ফিরে এলেন ল্যাবরেটরিতে। পরিস্ফুটনের কাজ শেষ হতেই সবাই ছবি দেখতে গেলেন, যদি কিছু অবশিষ্ট থাকে এই প্রত্যাশায়। কিন্তু বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন। নৌকাগুলোর পেছন দিক থেকে আলো থাকায় সেগুলো হয়ে উঠেছে ছায়ামূর্তি, স্বচ্ছ পালের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছে পড়ন্ত বিকেলের আলো; কালো জলের ওপর রৌদ্রালোকের প্রতিফলন সহস্র হীরের দীপ্তি নিয়ে ঝলমলিয়ে উঠে সৃষ্টি করেছে এক অপূর্ব নান্দনিক সৌন্দর্যের। চলচ্চিত্র নতুন অভিজ্ঞতা পেল।

স্প্যানিশ-অ্যামেরিকান যুদ্ধের উত্তেজনা শেষ হতে না হতেই শুরু হ'ল আলাস্কায় স্বর্ণসন্ধানের উত্তেজনা (Gold rush)। স্বর্ণসন্ধানীদের পেছন পেছন ছুটে চলল চলচ্চিত্রের ক্যামেরা। এডিসনের কর্মী বনাইন (Robert Bonine) তুললেন লোকজনদের থাকার জায়গা, বন্দর থেকে নৌকার যাতায়াত এইসব ছবি আর সুদূর আলাস্কায় এডিসনের হয়ে কাজ করতে গেলেন কারাহান (Tom Carahan)। কারাহানের পারিশ্রমিক ছিল ফুটপ্রতি পাঁচ ডলার। এ বছরই জেফ্রি (Jim Jeffries) এবং শার্কির (Tom Sharkey) মুষ্টিযুদ্ধ উপলক্ষে চলচ্চিত্র আরেক ধাপ এগিয়ে গেল। ব্যবস্থাপক ব্র্যাডি (William A. Brady) সম্পূর্ণ মুষ্টিযুদ্ধ সরাসরি চলচ্চিত্রায়নের জন্য চুক্তি করলেন বায়োগ্রাফ কোম্পানীর (American Mutoscope & Biograph Co.) সঙ্গে। ১৮৯০ সালের ৩রা নভেম্বর (Coney Island Atheletic Club-এ) রাত্রি বেলা অনুষ্ঠিত হ'ল এ লড়াই। ছবি তোলার জন্য নিযুক্ত হলেন বিজার। বিজার যুদ্ধক্ষেত্রের আয়তন সামান্য কমালেন এবং যত কাছাকাছি সম্ভব প্রায় চারশ'টি আলো (Arc lamp) ঝোলালেন। এদিকে লড়াই-এর সময় যোদ্ধাদের অবস্থা কাহিল হয়ে পড়ল। প্রচণ্ড উত্তাপের সৃষ্টি হ'ল আর্কল্যাম্পগুলো থেকে এবং সময়ের সাথে তাপও এগিয়ে চলল। প্রত্যেকটি পর্য্যায়ের (Round) শেষে যোদ্ধাদের হাওয়া করে ঠাণ্ডা করার চেষ্টা হ'ল। এর চেয়ে বেশী মুস্কিল হ'ল অন্য জায়গায়। প্রচণ্ড তাপে বৈদ্যুতিক তার গলে যাওয়ার উপক্রম হলে তাড়াতাড়ি বরফ কিনে এনে তার আর সুইচে চাপান হ'ল। এতে আগুন জ্বলার সম্ভাবনা গেল বটে কিন্তু একটু পরেই শুরু হ'ল মুষ্টি যোদ্ধাদের ওপরে গরম জলের বৃষ্টি। যাইহোক এত কাণ্ডের পর ছবি উঠল সুন্দর। চলচ্চিত্র আর শুধুমাত্র সূর্যালোকের ওপর নির্ভরশীল হয়ে রইল না।

মতান্তরে মেসকার (Oskar Messker : 1866-1943) ১৮৯৭ সালে তাঁর ষ্টুডিওতে প্রথম কৃত্রিম আলোয় চলচ্চিত্র গ্রহণে সমর্থ হন।

বিংশ শতাব্দীর শুরুতে চলচ্চিত্র আবার বৈচিত্র্যের অভাবে ভুগতে থাকল। লণ্ডনে হেপওয়ার্থের Rescued by Rover বা ব্ল্যাকটন-স্মিথের তোলা The burglar on the roof এর মাধ্যমে যেটুকু সামান্য গল্প বলার চেষ্টা করা হয়েছিল তা গল্প না হয়ে থেকে গিয়েছিল উপাখ্যানের (episode) স্তরে।

ওয়েস্ট অরেঞ্জে এডিসনের স্টুডিওতে এই অবস্থা থেকে মুক্তি পাবার চেষ্টা করতে থাকলেন কিনেটোগ্রাফ বিভাগের অধিকর্তা হোয়াইট (James A. White) এবং ক্যামেরাম্যান পোর্টার। এই দুজনের প্রচেষ্টাতেই তৈরি হ'ল 'The life of an American fireman'। বিষয়বস্তুতে চমক দেখা গেল। সম্পূর্ণ না হলেও একটা নির্দিষ্ট গল্প বলার চেষ্টা হ'ল। প্রথমে দর্শকরা দমকল বাহিনীর বিভিন্ন বিভাগ এবং ব্যবস্থার সাথে পরিচিত হলেন। পরিচয় করিয়ে দিলেন কেন্দ্রের প্রধান। এর পরই দৃশ্যান্তরে দেখা গেল একটা সাধারণ বাড়ী। বাড়ীর ভেতরে দোলনার মধ্যে একটা বাচ্চা ঘুমচ্ছে। জানলার পর্দা হাওয়ায় উড়ছে। জানলার নিচেই উনুনে আগুন। দুলতে দুলতে পর্দায় আগুন লেগে যায়। আতঙ্ক-গ্রস্ত মা অসহায় চোখে চেয়ে থাকেন—ধোঁয়ায় ভরে যায় ঘর। আবার দৃশ্যান্তরে দেখা যায় দমকল কেন্দ্রের বিপদ সংকেত—কর্মীরা দ্রুত গাড়ীতে উঠে পড়ে। চাবুক খেয়ে ঘোড়া ছুটে চলে তীব্র গতীতে। দৃশ্যান্তর—বাচ্চা দেলনায়—মা অসহায়। নাটক চুড়ান্ত জমে ওঠে যখন দেখা যায়, আগুন লাগা বাড়ীটা দমকল প্রধানেরই। যাইহোক, অবশেষে আগুন নিভে যায়, শিশু ও মা বিপদমুক্ত হয়। ছবি শেষ হয় Close-up এ।

এই ছবির সাফল্যের পরই পোর্টার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কাজটি করলেন। এবং এটাই তাঁকে স্মরণীয় করে রাখবে চিরকাল ইতিহাসের পাতায়। পোর্টার চেষ্টা করতে লাগলেন মঞ্চ সফল নাটক 'The Great Train Robbery'কে চিত্রায়িত করার। সহজ সরলভাবে দৃশ্যগুলোকে সাজিয়ে নিলেন পোর্টার। আগের চেয়ে অনেক বেশী মার্জিত হয়ে উঠল

তার চিত্রনাট্য। ১৯০৩ সালে ছবির কাজ শুরু হ'ল। একটা বিশেষ ট্রেনের ব্যবস্থা করা হ'ল। নিউজার্সি'র প্যাটারসন নামে একটা জায়গার কাছে ট্রেনের দৃশ্যগুলো গ্রহণ করা হ'ল। আর ঘোড়ার দৌড়ের দৃশ্যগুলো নেওয়া হয়েছিল এসেক্স কাউন্টি পার্কে। বিভিন্ন রকম নতুন প্রয়োগ পদ্ধতিতে সমৃদ্ধ আটশ ফুটের 'The Great Train Robbery' প্রচণ্ড জনপ্রিয়তা পেল। মোটামুটি সম্পূর্ণ একটা গল্প বলার প্রথম প্রচেষ্টা হ'ল চলচ্চিত্রে। ছবি দেখান হ'ল Eden Musee, Huber's Museum এবং Hammerstein's হলে।

১৯০৭ সালে নিউইয়র্কে এসে পেঁছিলেন গ্রিফিথ (David Wark Griffith : 1875-1948)। জীবিকার জন্য এর আগে তিনি বই বিক্রি, অভিনয় ইত্যাদি ছাড়া লুইভিলের এক খবরের কাগজের রিপোর্টারের চাকরীও করেছেন কিছুদিন।

'La Tosca'র চিত্রনাট্য পকেটে নিয়ে গ্রিফিথ একদিন এডিসনের লোকজনের সাথে দেখা করলেন। জানালেন লেখা ছাড়া অভিনয় ক্ষমতাও তাঁর আছে। পোর্টার তখন 'Rescued from an Eagle's nest' ছবি করার পরিকল্পনা করছেন। গ্রিফিথের চিত্রনাট্যের কিছু হ'লনা বটে, তবে পোর্টারের ছবিতে প্রধান চরিত্রে অভিনয়ের সুযোগ পেলেন। দিনে পাঁচ ডলার পারিশ্রমিকে গ্রিফিথ চলচ্চিত্র জগতে প্রবেশ করলেন। কিছু দিনের মধ্যেই এডিসনের কাছে কাজ শেষ হ'য়ে গেল তাঁর। আবার চিত্রনাট্য পকেটে করে আর অভিনয় ক্ষমতা সম্বল করে বেরিয়ে পড়লেন ভাগ্যান্বেষণে। ঘুরতে ঘুরতে একদিন এসে হাজির হলেন বায়োগ্রাফ কোম্পানীতে। এখানে তাঁর চিত্রনাট্যের একটা গুরুত্ব পাবার সম্ভাবনা দেখা দিল। এছাড়া অভিনয়ের সুযোগও রইল।

এডিসনের স্টুডিওতে গ্রিফিথের সাথে সাথে আর একজনও চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন ভাগ্য ফেরাবার। সেই কানাডিয়ান ভদ্রলোকের নাম সিনট (Michael Sinott : 1880-1960), যিনি পরবর্তীকালে বিখ্যাত হ'য়েছিলেন ম্যাক্ সেনেট নামে। এডিসনের বিস্মৃত ছবিগুলোর একটাতে অভিনয়ও করলেন বটে তবে পাকাপোক্ত বন্দোবস্ত হ'লনা। তিনিও একদিন বায়োগ্রাফে যোগ দিলেন।

বাজারে তখন ছিল ফিল্মের অসম্ভব চাহিদা। সেই চাহিদা পূরণের জন্য বায়োগ্রাফ চেষ্টা করছিল সপ্তাহে অন্তত দুখানা ছবি তৈরির। অভিনয় ছাড়া গ্রিফিথ সৃষ্টিধর্মী চিন্তা-ভাবনা করতে পারেন এটা নজরে পড়েছিল বায়োগ্রাফের আলোকচিত্র-গ্রহণকারী তথা মালিকের ভাই

আর্থারের (Arthur Marvin)। দাদার (H. N. Marvin) সাথে আলোচনার পর তিনি গ্রিফিথকে চলচ্চিত্র নির্মাণের সুযোগ দিলেন।

চলচ্চিত্রের ইতিহাসে যুগান্তকারী নাম গ্রিফিথ আত্মপ্রকাশ করলেন 'The Adventures of Dolly', ছবিতে। একটা বাচ্চাকে কিভাবে জিপসিরা অপহরণ ক'রল এই সামান্য বিষয়বস্তু নিয়ে মাত্র নয় মিনিটের ছবি। কিছু স্টুডিওর ভেতরে আর অধিকাংশই বাইরে তোলা ছিল এই ছবি। তবু ছোট্ট সাদা মাটা একটা গল্প সহজ, সুন্দর আর যুক্তিগ্রাহ্য করে উপস্থাপনার গুণে গ্রিফিথের অস্তিত্ব মনোযোগ আকর্ষণ করল।

পিল্যটন্ (Horace Plimpton) নামে মূলত এক কারপেট ব্যবসায়ী যখন এডিসনের চলচ্চিত্র বিভাগের প্রধান নিযুক্ত হ'লেন, তখন পোর্টার কাজ ছেড়ে দিলেন। পোর্টারের পক্ষে পিল্যটনের অধীনে কাজ করা সম্ভব ছিল না। কাজ ছেড়ে তিনি সোয়ানসন (William Swanson) নামে এক ভদ্রলোকের সহযোগিতায় তৈরী করলেন রেক্স (Rex) প্রতিষ্ঠান। রেক্স কোম্পানীর পরিচয় প্রতীক (Trade Mark) হ'ল অর্ধবৃত্তাকার তারার মালা। পরবর্তীকালে এই রেক্স কোম্পানীই পরিচিত হ'য়েছিল প্যারামাউণ্ট নামে (Paramount Pictures)।

Close-up এ গুরুত্ব, Fade-out এ যতি, Cut-back এ মুহূর্ত সৃষ্টি ইত্যাদি নিয়ে গ্রিফিথের শিক্ষকতায় যখন চলচ্চিত্র নিজস্ব ভাষার ব্যাকরণ আয়ত্ত করছিল, তখন এক অদ্ভুত সমস্যা দেখা দিল। চলচ্চিত্রের নাম কি হবে? অনেক দিন আগে থেকেই Kinetoscope, Nickelette, Theatorium, Nickelshow ইত্যাদি নামগুলো চালু ছিল। ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স এবং জার্মানী ছাড়া অন্যান্য দেশে ইতিমধ্যে 'সিনেমা' নাম চালু হ'য়ে গেছে।

অ্যামেরিকার খবরের কাগজগুলোতে ১৯০৯ সাল থেকেই মোটামুটি-ভাবে 'মুভি' শব্দটা ব্যবহৃত হচ্ছিল এবং এক বছরের মধ্যেই দেশ জুড়ে এই নামই গৃহীত হয়েছিল। চলচ্চিত্র শিল্পের সঙ্গে জড়িত লোকজনদের এই নাম বিশেষ পছন্দসই ছিলনা। সবচেয়ে ভাল নামকরণের জন্য এসেনে কোম্পানী প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করলেন। যদিও 'Photoplay' নাম দিয়ে Edgar Starkosch প্রথম পুরস্কার পঁচিশ ডলার জিতে নিলেন, তবু এই নাম 'মুভি' শব্দকে অতিক্রম করতে পারলনা।

বায়োগ্রাফ কোম্পানীতে যখন ছবি কেবলমাত্র স্বল্প দৈর্ঘ্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হ'য়ে গেল তখন গ্রিফিথ অন্য কোথাও যাবার চেষ্টা করতে থাকলেন। বায়োগ্রাফেরই একদা কর্মী সুলিভানের (Tony O' Sullivan) সূত্রে তাঁর সাথে যোগাযোগ হ'ল এ্যাটিকেনের (Harry E. Atiken) সাথে। এ্যাটিকেন ছিলেন 'Mutual Film Corporation'-এর প্রেসিডেণ্ট। ১৯১৩ সালের ১লা অক্টোবর গ্রিফিথ বায়োগ্রাফ কোম্পানীর কাজে ইস্তফা দিলেন এবং ২৯শে অক্টোবরের খবরের কাগজ মারফৎ জানতে পারা গেল তিনি মিউচুয়াল কোম্পানীতে যোগদান করেছেন। মোটা মাইনে এবং মালিকানার অংশ ছাড়া বছরে দুখানা ছবি নিজের ইচ্ছামত করার অধিকার মিউচুয়ালের সাথে চুক্তিতে রইল।

এখানে এসে সাত দিনের মধ্যেই গ্রিফিথ তৈরী করলেন 'Battle of Sexes'। ছবি যথেষ্ট জনপ্রিয় হ'ল। একদিন, চিত্রনাট্য বিভাগের প্রধান উড্স (Frank Woods) গ্রিফিথকে রেভারেণ্ড ডিক্সনের (Rev. Thomas Dixon) লেখা 'The Clansman'-এর নাট্যরূপ দেখালেন। অ্যামেরিকার গৃহযুদ্ধের পটভূমিতে এই কাহিনীর বিস্তার। দেশের ইতিহাসের প্রতি গ্রিফিথের এক বিশেষ দুর্বলতা এর আগে স্বল্প দৈর্ঘ্যের ছবি 'The Massacre' (১৯১২)-এ লক্ষ্য করা গিয়েছিল। সেই স্বভাবজ আকর্ষণ তীব্র হয়ে উঠল এই ক্ল্যান্‌স্‌ম্যান প'ড়তে প'ড়তে।

গ্রিফিথ প্রস্তুত হ'তে থাকলেন। তাঁর সাত বছরের অভিজ্ঞতা, চলচ্চিত্রের আপন ভাষার ওপর তাঁর দখল, দর্শকদের আবেগ অনুভূতির ওপর তাঁর প্রভাব বিস্তারের ক্ষমতা, সব তিনি কেন্দ্রীভূত করতে থাকলেন। সমাজ জীবনে এবং ব্যক্তিজীবনে গৃহযুদ্ধের ব্যাপক প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ প্রভাব তাঁর মস্তিষ্কে চলচ্চিত্রের ভাষায় প্রতিবিম্বিত হ'তে থাকল।

বিরাট পটভূমির এই ছবির জন্য স্বাভাবিকভাবেই প্রয়োজন ছিল প্রচুর অর্থের। ছবি শুরু হয়ে যাবার পর প্রায় ছয় বার বন্ধ হবার উপক্রম হয়েছিল অর্থাভাবে। একা কোন প্রযোজকের পক্ষে তখনকার দিনে এত খরচের অভিজ্ঞতা ছিলনা। গ্রিফিথের পক্ষে তখন আর পেছিয়ে আসা সম্ভব

ছিলনা। তাঁর শিল্পী সত্ত্বা তখন পূর্ণ বিকাশের প্রতীক্ষায়। তিনি টাকা সংগ্রহের জন্য কারো কাছে হাত পাততে বাকী রাখলেন না।

বহু বাধা বিপত্তির পর একদিন এই ছবি নির্মাণের কাজ শেষ হ'ল। ১৯১৪ সালের জুলাই থেকে অক্টোবর অবধি ছবির চিত্রগ্রহণের কাজ হয়েছিল। এর পর তিন মাস লাগল ছবির সম্পাদনায়।

ছবি শেষ হয়েই মুখোমুখি হ'ল প্রদর্শন সমস্যার। প্যারামাউন্টের সাথে কথাবার্তা চললেও অসুবিধা নানা রকম দেখা দিতে থাকল। তাদের তখন এক বিরাট ছবির কাজ চলছিল রোমে। সেখানে পোর্টারের পরিচালনায় প্রায় এক লক্ষ ডলার ব্যয়ে নির্মাণ হচ্ছিল 'The Eternal City'। গ্রিফিথের বর্ণবৈষম্যের ছবির সাথে প্যারামাউন্ট যখন নিজেদের জড়াতে চাইল না, তখন গ্রিফিথেরই দায়িত্বে তৈরি হ'ল 'Epoch Film Corporation'।

লস্ এঞ্জেল্সের 'Clune's Auditorium'-এ ১৯১৫ সালের ৮ই ফেব্রুয়ারীর রাত্রিতে, ১২ রীলের 'Clansman'-এর প্রথম প্রদর্শনী হ'ল। দর্শকরা পেলেন এক অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতা। বিস্ময়ে হতবাক হ'য়ে গেলেন সবাই। চলচ্চিত্রের ক্ষমতায় শঙ্কিত হ'য়ে উঠলেন রাজনৈতিক নেতারা। পুলিশকে সতর্ক করে দেওয়া হ'ল সম্ভাব্য দাঙ্গার জন্য।

এরপর দেখলেন 'হোয়াইট হাউসে' রাষ্ট্রপতি উইলসন। সঙ্গে রইলেন সুপ্রিম কোর্টের বিচারকরা এবং মন্ত্রিসভার সদস্যরা। ছবি দেখে রাষ্ট্রপতি মন্তব্য করলেন, 'It is like writing history in lightning'।

১৯১৫ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারীর রাত্রি ছিল বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ। এই রাত্রিতে নিউইয়র্কের রোজ গার্ডেনে (Rose Gardens) ছবি দেখান' হবার পর লেখক ডিক্সন গ্রিফিথকে বললেন ছবির বলিষ্ঠ বাচনভঙ্গীর পক্ষে 'Clansman' নামটা বেমানান লাগছে, এর নাম হোক 'The Birth of a Nation'।

৩রা মার্চ নতুন নামে নিউইয়র্কের 'Liberty Theatre'-এ জনসাধারণের সামনে মুক্তি পেল এই ছবি। টিকিটের দাম হ'ল দুই ডলার করে। এই ছবি এ যাবৎ সমস্ত ছবির জনপ্রিয়তাকে ম্লান ক'রে দিল। এমন কি ছবি তৈরীর নয় বছর বাদে, অর্থাৎ ১৯২৪ সালের প্রথম দিকে যখন

শিকাগোর 'Auditorium Theatre'-এ এই ছবি দেখান হয় তখন যা টিকিট বিক্রি হয় তা ছিল ওই প্রেক্ষাগৃহের ইতিহাসে সর্বোচ্চ।

'The Birth of a Nation' অ্যামেরিকার চলচ্চিত্র ইতিহাসে সবচেয়ে বিতর্কিত ছবি হিসেবে গণ্য হ'ল। ঝড় উঠল সামাজিক এবং রাজনৈতিক জগতে। সেন্সর সমস্যা, রাজনৈতিক নেতাদের ছবির বিরুদ্ধে মামলা ইত্যাদি ত' হ'লই, 'New Republic' কাগজের Francis Hackett উপন্যাসের লেখককে ব্যক্তিগত আক্রমণ পর্য্যন্ত চালালেন। Oswald Garrison Villard লিখলেন— 'a deliberate attempt to humiliate 10,000,000 American citizens and portray them as nothing but beasts'। 'National Association for the Advancement of Coloured People' ছবির বিরুদ্ধে প্রচার পুস্তিকা বিতরণ করতে থাকলেন।

এই সমস্ত বিরুদ্ধাচরণের ফলে নিউইয়র্কের মেয়রের অনুরোধে গ্রিফিথকে হাজির হ'তে হ'ল বিশেষ কমিটির সামনে এবং ছবি থেকে বাদ দিতে হ'ল প্রায় একশ সত্তরটা দৃশ্য। বাকি এক হাজার তিনশ' চুয়াত্তরটার প্রদর্শন সময় রইল প্রায় একশ পঁয়ষট্টি মিনিট।

গ্রিফিথ এই সব অভিযোগ অপমানের বিরুদ্ধে বক্তৃতা দিলেন বিভিন্ন জায়গায়, কাগজে লিখলেন। সংগ্রাম চালালেন মতামত প্রকাশের স্বাধীনতার স্বপক্ষে। সমস্ত অভিযোগের উত্তরে তাঁর বক্তব্য ছিল শিল্পের অধিকার......'to show the dark side of wrong, that we may illuminate the bright side of virtue'। বাস্তবিক 'The Birth of a Nation' এর একদৃশ্যে এই কথা লিখিত ছিল 'Dare we dream of a golden day when the bestial War shall rule no more. But instead the gentle Prince in the Hall of Brotherly Love in the City of Peace'।

বিভিন্ন মহলের তীব্র বিরোধিতা ছবিটাকে দিয়েছিল ব্যাপক প্রচার। ছবি তৈরি করতে খরচ হয়েছিল ১১০,০০০ ডলার, আর সামান্য কয়েকদিনের মধ্যেই আয় হয়েছিল প্রায় ১৮,০০০,০০০ ডলার।

এই ছবি হ'ল এ যাবৎ কালে নির্মিত সমস্ত ছবির চেয়ে বেশী গুরুত্ব-পূর্ণ শুধুমাত্র এর বিষয়বস্তুর জন্য নয় চলচ্চিত্রের নিজস্ব ভাষার বুনিয়াদ নির্মাণে এর গুরুত্ব চিরকালের জন্য অপরিসীম। বর্ণনাধর্মী দৃশ্যগ্রহণ (Panning), সম্পাদনায় বিপরীত এবং অনুষঙ্গ সুরের মিশ্রণ (contra-puntal editing), সত্যকার রাত্রির দৃশ্যগ্রহণ, স্বপ্ন দৃশ্যের অভিনব ব্যবহার, বিশেষ মেজাজ আনার জন্য বিভিন্ন বর্ণের ব্যবহার ইত্যাদি সমৃদ্ধ এই ছবি চলমান ছবির শুধুমাত্র মনোরঞ্জনের উদ্দেশ্যকে অতিক্রম ক'রে উপস্থিত হ'ল নিজস্ব প্রকাশ ভঙ্গীমায় সমুজ্জল হ'য়ে। সৃষ্টি করল এই মাধ্যমের স্বতন্ত্র ভাষা যার উপরেই আবর্তিত হ'তে থাকল আগামীকালের যাবতীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা।

সামাজিক রাজনৈতিক গোঁড়ামি. ধর্মীয় সংস্কার ইত্যাদির উত্তর স্বরূপ তৈরি হয়েছিল তাঁর পরের ছবি 'Intolerance' (১৯১৬)। এরও কিছু পরে জার্মানীতে ১৯২৪ সালে সৃষ্টি করেন 'Isn't lifc wonderful', যে ছবি চলচ্চিত্রে নয়া-বাস্তববাদের সূচনা করেছিল।

এডুইন এস পোর্টার

The Great Train Robbery

ডেভিড ওয়ার্ক গ্রিফিথ

বার্থ অফ্ এ নেশান

সমকালীন উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী

(১৮৯৫-১৯১৫)

অ্যামেরিকা :

'A Fool There was'-এ বারা (Theda Bara) অভিনয় করে রাতারাতি জনপ্রিয়তার শীর্ষে আরোহন করলেন ; চলচ্চিত্রে প্রথম খল-নারী (Vamp) চরিত্র। এই ছবি কিপলিং (Rudyard Kipling)-এর কবিতা 'The Vampire' থেকে অনুপ্রাণিত, যে কবিতা আবার জোন্‌সের (Sir Edward Burne Jones) এক ছবি থেকে অনুপ্রাণিত হয়েছিল।

গ্রিফিথের প্রায় গররাজী হ'য়ে তৈরি 'The Lamb' ছবিতে অসামান্য অভিনয় ক্ষমতা দেখালেন ফেয়ারব্যাংক্‌স (Douglas Fairbanks)।

চ্যাপলিন, এসেনে সংস্থায় সপ্তাহে ১২৫০ ডলারের চুক্তিতে আবদ্ধ অবস্থায় তাঁর ১৭তম ছবি শেষ করলেন। এর মধ্যে 'The Champion', 'His New Job' ইত্যাদিও ছিল।

ডি মিল (Cecil B. De Mille) তাঁর নিজের প্রযোজনায় 'Carmen' ছবি শুরু করলেন, যেটা আবার চ্যাপলিন করেছিলেন ১৯১৬ সালে।

'Fox Corporation' তৈরি হ'ল।

কবি লিণ্ড্‌সে (Vachel Lindsay) প্রথম প্রকৃত চলচ্চিত্র আলোচনার বই লিখলেন—'The Art of Moving Picture'। পানামা খাল খুলে দেওয়া হ'ল।

ফোর্ড (Henry Food) প্রথম চাষের কাজে উপযুক্ত ট্রাক্টর তৈরী করলেন।

উইল্‌সন (Henray Leon Wilson) প্রকাশ করলেন 'Ruggles of Red Gap' যে উপন্যাস চলচ্চিত্রায়িত হ'ল হর্টনের (Edward Everett

Horton) হাতে ১৯২৩ সালে এবং লটনের (Charles Laughton) দ্বারা ১৯৩৫ সালে।

ফ্রান্স :

গ্যান্স (Abel Gance) 'La Folie du Docteur Tube' ছবি শেষ করলেন। যদিও এই ছবি মুক্তি পায়নি, কিন্তু চলচ্চিত্রে নন্দনতত্ত্বের বিচারে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বলা হয়।

ক্রাউস (Henry Krauss) পরিচালনা করলেন 'Le Chemineau'। মোদিগ্লিয়ানি (Amedeo Modigliani) ভাস্কর্য ছেড়ে অঙ্কনে মন দিলেন। পিকাসো (Pablo Ruizy Picasso) কিউবিজমে (Cubism) আত্মনিয়োগ করলেন। (Pierre Auguste Renoir) আঁকছেন 'Corsage Rose' এবং 'Paysage Bleu'। ডুকাম্প (Marcel Duchamp) শুরু করলেন 'La Marjee Mise a Nu par ses Celibataires, Meme'। যেটা শেষ করতে সময় লেগেছিল ৮ বছর।

র‍ল্যা (Romain Rolland) নোবেল পুরস্কার পেলেন।

ইংল্যাণ্ড :

পিয়ার্সন (George Pearson) শুরু করলেন 'Ultus The Man from the Dead'।

প্যারি (Hubert Parry), ব্লেকের (William Blake) 'Jerusalem'-এ সুর দিলেন। হোল্‌ষ্ট (Gustav Holst) তাঁর বিখ্যাত সুর সৃষ্টি 'The Planets' শেষ করলেন।

মমের (Somerset Mougham) 'Of Human Bondage' প্রকাশিত হ'ল। লরেন্সের (D. H. Lawrence) 'The Rainbow' অশ্লীল ঘোষিত হ'ল। প্রকাশকের জরিমানা হ'ল এবং সমস্ত বই নষ্ট করে দেবার আদেশ দেওয়া হ'ল।

জার্মানী :

গালীন (Henrik Galeen) এবং ভেগেনের (Paul Wegener) নির্মাণ করলেন 'The Golem'।

যুদ্ধে প্রথম বিষাক্ত গ্যাস ব্যবহৃত হ'ল। আইনস্টাইনের (Albert Einstein) 'Theory of Relativity'।

ইটালী :

ডুসের (Elenora Duse) অভিনীত একমাত্র ছবি 'Cenere' শেষ হ'ল। এই ছবিকে অনেকে নয়া-বাস্তববাদের (Neo-realism) সূচনাকারী ছবি হিসেবে অভিহিত করেন। পিরান্দেল্লো (Luigi Pirandello) চলচ্চিত্রের জগৎ নিয়ে উপন্যাস 'Si Gira' শুরু করলেন।

ইটালী যুদ্ধে যোগ দিল।

চিরিকো (Giorgio de Chirico) আঁকলেন Melancolie du Depart'।

রাশিয়া :

মেয়ারহোল্ড (Vacovolod Meyerhold) ওয়াইল্ডের 'The Picture of Dorian Gray' চলচ্চিত্রায়িত করলেন। ১৯৪৪ সালে অ্যামেরিকায় আবার এই ছবি তৈরি হ'ল লুইয়েনের দ্বারা (Albert Lewin)।

শাগাল আঁকলেন (Marc Chagall) 'Le Poete Allonge'।

ডেনমার্ক :

নেল্‌সন (Asta Nelson) অভিনয় করলেন 'Dark Dream'-এ। ক্রিসটেনসেন (Benjamin Christensen) পরিচালনা করলেন 'Night of Revenge'।

মহিলারা ভোটাধিকার পেলেন।

তুরস্ক :

প্রথম কাহিনী চিত্র 'The Wedding of Himmet Aga' যুদ্ধের জন্য বন্ধ হ'য়ে গেল। পরে এই ছবি নির্মিত হয় ১৯১৮ সালে।

ভারতবর্ষ ঃ

দাদা সাহেব ফাল্কে নির্মাণ করলেন 'রাজা হরিশচন্দ্র'। চিত্রগ্রহণ কলাকৌশলের চমৎকার ব্যবহারের জন্য তাঁকে ভারতের মেলিস আখ্যা দেওয়া হ'ল।

মেসোপটেমিয়াতে ভারতীয় বাহিনী ইংরেজদের দ্বারা ব্যবহৃত হ'ল তুরস্কের সৈনিকদের বিরুদ্ধে।

জাপান ঃ

তলস্তয়ের 'Ressurection' অবলম্বনে 'Katusha' পরিচালনা করলেন Kiyomatsu Hosoya।

জাপান জার্মানীর সাথে শান্তি চুক্তিতে অসম্মত হ'ল।

১৯১৪ সালে শুরু হ'য়েছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ।

চলচ্চিত্রের বিশিষ্ট এবং স্বতন্ত্র আঙ্গিকে যার প্রভাব গ্রিফিথের সাথে সাথেই পড়ছিল, তিনি হলেন চ্যাপলিন (Charles Chaplin :

চ্যাপলিন ইংল্যাণ্ড থেকে অ্যামেরিকায় আসেন এক নাটকের দলের সাথে ১৯১০ সালের অক্টোবর মাসে। কার্ণোর (Fred Karno) দলের সাথে চ্যাপলিনের তিন বছরের জন্য অ্যামেরিকায় আসা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। ১৭ বছর বয়সে চ্যাপলিন স্টেজ-কমেডিয়ান হিসেবে মোটামুটি খ্যাতি পেয়ে গিয়েছিলেন কার্ণো কোম্পানীতে আসার আগেই। চ্যাপলিনের প্রতিভা ঠিকই নজরে পড়ল ম্যাক্ সেনেটের। সেনেট তখন ছিলেন Keystone কোম্পানীর অধিকর্তা। Kessel & Bauman কোম্পানী সেনেটের অনুরোধক্রমে চ্যাপলিনকে সপ্তাহে ১৫০ ডলার পারিশ্রমিকের প্রস্তাব দিল। এটা ছিল চ্যাপলিনের তখনকার রোজগারের প্রায় তিনশ গুণ বৃদ্ধি। চ্যাপলিন ১৯১৩ সালের শেষদিকে মঞ্চ ছেড়ে চলচ্চিত্রে যোগ দিলেন।

সেনেট চলচ্চিত্রের ইতিহাসে চ্যাপলিনের আবিষ্কর্তা হিসেবেই শুধুমাত্র নয়, স্ক্রিন কমেডির জনক হিসেবেও তিনি চিহ্নিত হয়ে রয়েছেন।

যদিও চ্যাপলিনের প্রথম ছবি পরিচালনা করেছিলেন অপর এক ব্যক্তি যিনি আবার গ্রিফিথের বায়োগ্রাফ কোম্পানীরই লোক। তাঁর নাম ছিল লেরম্যান (Henry Pathey Lehrman)। প্রথম ছবির নাম ছিল 'Making a Living'। ছবি মুক্তি পেল ১৯১৪ সালের ২রা ফেব্রুয়ারী।

চ্যাপলিনকে আমরা যে চেহারায় দেখতে অভ্যস্ত সেটা প্রথম দেখা গিয়েছিল ১৯১৪ সালের ৭ই ফেব্রুয়ারীতে মুক্তিপ্রাপ্ত 'Kid Auto Races at Venice'। খুব তাড়াহুড়োর মধ্যে পোষাকের ব্যবস্থা করতে গিয়ে হাতের কাছে যা পেয়েছিলেন তাই পরে নিয়েছিলেন চ্যাপলিন। সহকারী Arbuckle-এর প্যান্ট, Ford Sterling-এর জুতো, যা পায়ে বড় হচ্ছিল বলে উল্টো করে পরতে হয়েছিল এবং Mack Swain-এর গোঁফ।

১৯১৪ সালের মধ্যেই চ্যাপলিনের জনপ্রিয়তা শীর্ষে পেঁছিল। সেনেট বিচক্ষণতার সঙ্গে সিদ্ধান্ত নিলেন চ্যাপলিনের ছবিগ্নলোর লেখা-পরিচালনা ইত্যাদি সব দায়িত্ব চ্যাপলিনকেই দিয়ে দিতে। কিস্টোন কোম্পানীতে থাকাকালীন চ্যাপলিন ৩৫ খানা ছবি করেন। এর মধ্যে সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিল 'Tillie's Punctured Romance'। ১৯১৪ সালের ১৪ই নভেম্বর মুক্তিপ্রাপ্ত ৬ রীলের এই ছবি ছিল বিশ্বের প্রথম ফিচার লেংথ কমেডি। এই ছবি 'The Birth of a Nation'-এর আগে মুক্তি পায়। ছবি করতে চ্যাপলিনের লেগেছিল প্রায় ১৪ সপ্তাহ। তৎকালীন সময়ে একটা ছবি তৈরীর সাধারণ সময়মান ছিল ১ সপ্তাহ। এই সময়ে তার তোলা উল্লেখযোগ্য ছবিগ্নলোর মধ্যে—'Dough and 'Dynamite', 'His Trysting Place', 'Laughing Gas, এবং 'The Face on the Bar-room Floor' প্রমাণ করে যে চ্যাপলিন তখনো তাঁর ভবঘুরে চরিত্রটির পূর্ণতা আনার পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছেন, যার সম্পূর্ণ বিকাশ আমরা দেখতে পাই ১৯১৫ সালের মাঝামাঝি সময় থেকে।

১৯১৫ সালের জানুয়ারী মাসে সপ্তাহে ১২৫০ ডলারের চুক্তিতে তিনি চলে গেলেন এসেনে কোম্পানীতে। বলা যেতে পারে এইখান থেকেই চ্যাপলিনের প্রতিভার পূর্ণ প্রকাশ ঘটতে শুরু করল। ১৯১৫ সালে ১১ই এপ্রিল মুক্তিপ্রাপ্ত 'The Tramp' ছবিতে সেই ভবঘুরে চরিত্রটি নিয়ে এলো চলচ্চিত্রে প্রথম করুণরস, উন্মোচিত হ'ল জীবনের অসহায় বেদনাময় দিকগ্নলো।

চ্যাপলিনের জনপ্রিয়তার ব্যাপকতা বোঝা গেল যখন Mutual Company চ্যাপলিনকে বছরে ৬,৭০,০০০ ডলারের প্রস্তাব দিল। এখানে চ্যাপলিনের হাতে তৈরী হ'ল দু' রীলের মধ্যে তাঁর অমর সৃষ্টিগ্নলো। ১৯১৬ সালে আমরা পেলাম, 'Floorwalker', 'The Vagabond', 'The Pawnshop' এবং 'One a.m.' ইত্যাদি ছবি। 'One a.m.' এ ট্যাক্সি ড্রাইভারের সামান্য একটুখানি ছাড়া সমস্তটাই একা অভিনয় করলেন চ্যাপলিন। মূকাভিনয়ের সুনিপুণ দক্ষতায় চ্যাপলিন এই পরীক্ষা-মূলক ও দুঃসাহসিক ছবিকে এনে দিলেন পূর্ণ সফলতা। 'The Immigrant' তৈরী হ'ল ১৯১৭-তে এবং তার সৃষ্টি ভবঘুরে চরিত্র পূর্ণতা পেল 'Easy Street' ছবিতে।

১৯১৭ সালে মিউচুয়াল কোম্পানীর অবিশ্বাস্য পারিশ্রমিক বছরে ১০,০০,০০০ ডলারের প্রস্তাবও তাঁকে ধরে রাখতে পারল না, যখন First National Company তাঁকে বছরে ১০,০০,০০০ ডলার তৎসহ লভ্যাংশ হিসেবে ১৫,০০০ ডলারের প্রস্তাব দিল। এখানে কাজের পরিমাণও যথেষ্ট কম ছিল। ১৮ মাসে মাত্র ৮ খানা ছবি তৈরী করতে হবে। চ্যাপলিনের এত পারিশ্রমিকের পেছনে আর একটা যুক্তিও কাজ করে তা হ'ল নিজের ছবির প্রযোজক হওয়ার অন্তর্নিহিত বাসনা যা তাকে দিতে পারবে পূর্ণ শৈল্পিক স্বাধীনতা। কেননা তাঁর ফিল্ম-খরচের বহর ছিল মারাত্মক। দু' রীলের ছবি 'The Immigrant' করতে খরচ হয়েছিল, গ্রিফিথের ১২ রীলের ছবি 'The Birth of a Nation' এর সমান।

যাইহোক ১৮ মাসে চ্যাপলিন তৈরি করলেন মাত্র তিনখানা ছবি, 'A Dog's life' 'Shoulder Arms' এবং 'Sunny side'। শিল্পবোধ আর একধাপ এগিয়ে এল, নজর পড়ল ব্যক্তিচরিত্রের পূর্ণাঙ্গ রূপায়ণের দিকে।

১৯২১ সালে তৈরী হ'ল 'The kid'। চলচ্চিত্রে এক যুগান্তকারী ঘটনা। চ্যাপলিনের খ্যাতি প্রসারিত হ'ল দিকে দিকে। প্রতিভার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত এই ছবি নিয়ে এল এক গভীর মানবিক আবেদন তার ছয় রীলের শরীরের মধ্যে। তাঁর 'The Kid'—'A Picture with a smile-perhaps a tear' প্রমাণ করল মানবচরিত্রের অতি সূক্ষ্ম অনুভূতিকে সীমাহীন মমতা, হৃদয়ের সমস্ত উত্তাপ দিয়ে শিল্পোত্তীর্ণ সৃষ্টিতে রূপান্তরিত করার ক্ষমতা। এর পরে চ্যাপলিন কিছুদিন কাজ করতে পারলেননা, তাঁর প্রথম বিবাহ-বিচ্ছেদের ব্যাপারে। 'Pay Day', 'The Idle class' এবং 'The Pilgrim' ছবিগুলো শেষ হওয়ার সাথে সাথে মিউচুয়াল কোম্পানীর সাথে চ্যাপলিনের চুক্তিও শেষ হ'ল।

এরপর পিকফোর্ড, ফেয়ারব্যাঙ্কস এবং গ্রিফিথকে সঙ্গে নিয়ে ১৯১৯ সালে তৈরী করলেন 'United Artists'।

ইউনাইটেড আর্টিস্টের প্রথম ছবি 'A woman of Paris'-এ চ্যাপলিন নিজে অভিনয় করলেন না। আর্থিক আনুকূল্য না পেলেও

এই ছবি শিল্প-নিদর্শন হিসেবে সমালোচকদের প্রচুর প্রশংসা পেল। ১৯২৩ সালের অক্টোবরে মুক্তিপ্রাপ্ত এই ছবিতে জটিল মানবচরিত্রের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ সিনেমাশিল্পে এক নতুন ধারার প্রবর্তন করে সিনেমার ভাষায় গতানুগতিকতার ছেদ টানল।

এর পরের ছবি মুক্তি পেল ১৯২৫ সালের অগাস্ট মাসে—প্রায় দু'বছর বাদে। ছবির নাম 'The Gold Rush'। প্রায় ১৪ মাস ধরে ১০,০০০০০ ডলার বিনিয়োগে তৈরী হয়েছিল এই ছবি। অনেক সমালোচকের মতে চ্যাপলিনের জীবনের শ্রেষ্ঠ শিল্পকীর্তি এই ছবি এবং চ্যাপলিন নিজেও এই ছবি সম্বন্ধে বলেছেন, 'This is the picture, I want to be remembered by'। সিনেমার ইতিহাসের দিক থেকে এখানে একটা কথা বলা মনে হয় অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক, তা হ'ল এই বছরেই পৃথিবীর মানুষ উপহার পেল আর একখানি অবিস্মরণীয় শিল্পকীর্তি—পৃথিবীর আর এক প্রান্ত থেকে। সেই ছবির নাম 'Battleship Potemkin'। তৈরী করলেন সোভিয়েত চিত্র পরিচালক সের্গেই আইজেনস্টাইন। ১৯২৮ সালে তৈরি হ'ল চ্যাপলিনের 'The Circus'। এই বছরের প্রথম দিক থেকেই চলচ্চিত্রে শব্দের ব্যবহার শুরু হয়েছিল, কিন্তু এই যান্ত্রিক অগ্রগতিকে চ্যাপলিন সহসা গ্রহণ করেন নি। ১৯৩১ সালে তৈরি 'City lights' ছবিতে সামান্য আবহ সঙ্গীত ও কিছু শব্দ ব্যবহার অনুমোদন করলেন। সবাক যুগে আগাগোড়া নির্বাক একটা ছবির এতখানি আর্থিক সাফল্য চ্যাপলিনের ক্ষমতার পরিচয় দিল আর একবার। ছবির আবহসঙ্গীত নিজে রচনা করলেন। একাধারে কাহিনীকার, অভিনেতা, সঙ্গীত পরিচালক এবং পরিচালক হওয়া সিনেমার ইতিহাসে এই প্রথম ঘটল।

১৯৩৪ সালে শুরু করলেন ইউনাইটেড আর্টিস্টের চতুর্থ ছবি 'The Masses'। ১৯৩৬ সালে এই ছবি মুক্তি পেল 'Modern Times' নামে। যান্ত্রিক সভ্যতাকে তীব্র ব্যঙ্গ করল এই ছবি। ছবির প্রতিক্রিয়া হ'ল বিভিন্ন রকমের। যাইহোক, প্রতিক্রিয়া চরম হ'ল ফ্যাসিস্ট শক্তি শাসিত জার্মানী ও ইতালীতে। এসব দেশে ছবির প্রদর্শন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ হ'য়ে গেল। সমাজে গৃহীত অর্থহীন মূল্যবোধগুলির অসারতার নিদর্শনে

পৃথিবীর শতকরা ৯০ জন মানুষই আর একবার প্রাণ খুলে হাসলো, আরো দু'দণ্ড ভাবলো নতুন করে। এই ছবিতেই প্রথম চ্যাপলিনের কণ্ঠস্বর শোনা গেল।*

১৯৪০ সালের অক্টোবর মাসে তাঁর সবচেয়ে দীর্ঘ ছবি 'Great Dictator' প্রদর্শিত হ'ল। এখানে ফ্যাসিস্ট শক্তিকে চ্যাপলিন সরাসরি আক্রমণ করলেন। শেষ দৃশ্যে নাপিত-নায়ক প্রেরণার আমেজে উন্মাদ হয়ে বলে চলল—'The clouds are lifting—the sun is breaking through—We are coming out of the darkness, into a new world where men will rise above their hatred, their greed and their brutality. The soul of men has been given wings and at last he is beginning to fly. He is flying into the rainbow, into the light of hope into the future।' শিল্প প্রতিপন্ন বিশ্বভাবুকতা ও বাস্তব জীবন বোধের মহান সংকল্পে সৃষ্টি হ'ল 'Monsieur Verdoux' এবং 'The Limelight'-চলচ্চিত্রের মহাকাব্য, যার ভূমিকা ঐতিহাসিক ; সূচনা হ'ল চলচ্চিত্রের মত বলিষ্ঠ মাধ্যমের।

'Modern Times' ছবির সাথে ক্লেয়ারের পাঁচ বছর আগের সৃষ্টি 'A Nous La Liberte'-এর বিশেষ মিল লক্ষ্য করেন এবং জানতে পারেন চ্যাপলিন চিত্রনাট্য রচনার আগে অন্তত তিনবার ক্লেয়ারের ছবি দেখেছেন। সমস্ত ব্যাপারটা ক্লেয়ারের গোচরে আনার পরও তিনি কোনও গুরুত্ব দিলেন না। এমনকি 'Modern Times' প্রথম প্রদর্শনের (Rivoli—New York) পর অ্যামেরিকার সংবাদপত্রগুলোও এই ব্যাপারে সোচ্চার হয়।

ক্লেয়ারের মত উদার দৃষ্টিভঙ্গী তাঁর ছবির প্রযোজকদের (Tobis, Film Sonor, Paris) ছিল না। তাঁরা ব্যাপারটার নিষ্পত্তি আদালতে চেয়েছিলেন। ক্লেয়ার এ ব্যাপারে উৎসাহ দেখান ত' দূরে থাক বরং শান্তভাবে সবাইকে নিবৃত্ত করলেন। সমস্ত অভিযোগ অসন্তোষের উত্তরে তিনি বললেন—"All cinema is indebted to Chaplin, we are all the offspring of this man, whom I admire, and if he has been inspired by my film it is a great honour for me." (Page 1-2, Classic Film Scripts, A Nous La Liberate & Entracte, films by Rene clair—Lorrimer Publishing, London 1970).

চার্লস চ্যাপলিন

সের্গেই মিখাইলোভিচ আইজেনস্টাইন

চলচ্চিত্র এবং অন্যান্য দেশ

অ্যামেরিকায় চলচ্চিত্রের সূত্রপাতের সাথে পরিচয় হয়ে যাওয়ায় পর, পৃথিবীর অন্যান্য দেশে চলচ্চিত্র কি ভাবে তার যাত্রা শুরু করেছিল তা মোটামুটি জেনে রাখা প্রয়োজন।

ইংল্যাণ্ড

ইংল্যাণ্ডে জনসাধারণের জন্য প্রথম চলচ্চিত্র প্রদর্শনী করেন লুমিয়ের ভাইদের প্রতিনিধি লুসিয়ান ট্রেউই (Lucian Trewey)। ছবি দেখানো হয় ২০শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৯৬—রিজেন্ট স্ট্রীটের পলিটেক্‌নিক্‌ হলে।

এর থেকেই প্রভাবিত হলেন, ফ্রীজ্‌ গ্রীন (William Friese Greene : 1855-1921) এবং বার্ট একারস্‌ (Birt Acres : 1854-1918)। এরা দু'জনে মিলে অসংখ্য ছোট ছোট ছবি তুলেছিলেন। এর মধ্যে বিখ্যাত হয়েছিল ডার্বি রেসের ছবি। প্রকৃতপক্ষে চিত্ত-বিনোদনের মাধ্যম হিসেবে এটাকে চিনতে ও নিয়ন্ত্রণ করতে পেরেছিলেন পল (R. W. Paul : 1869-1943)। তাঁর স্টুডিও ছিল উত্তর লণ্ডনের Mies Well Hill-এ। মেলিজ-এর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তিনি অনেকগুলো trick-film-ও তৈরী করেছিলেন। R. W. Paul-এর কথা আমরা বিস্তারিত ভাবে আগে পেয়েছি।

এর পরে যার নাম মনে পড়ে তিনি হলেন জর্জ স্মিথ (George Albert Smith : 1864-1959)। ১৮৯৬ সালে তিনি নিজেই ক্যামেরা তৈরি করে তাঁর বাড়ির পিছনের বাগানে ছবি তুলতে শুরু করেন—এর মধ্যে বিখ্যাত হয়েছিল 'The Corsican Brothers' (1897), 'The Fairy Godmother' (1898) এবং 'Faust and Mephistopheles' (1898)। স্মিথের সাথে ঘনিষ্ঠ ভাবে যিনি কাজ করেছিলেন তাঁর নাম Alfred Darling। তিনি ছিলেন মূলত ক্যামেরা ডিজাইনার এবং ইঞ্জিনিয়ার। ১৯০০ সালে তিনি Charles Urban-এর (যাঁর কাজের

উল্লেখ করা হয়েছে) Warwick Trading Co.-তে যোগদান করেন। এই স্মিথ আর আরবানই ১৯০৬ সালে 'Kinema Colour' উদ্ভাবন করেন।

চলচ্চিত্রের শৈশব অবস্থায় এই শিল্প মাধ্যমটিকে দাঁড়াতে যাঁর সাহায্য ছিল অন্যতম, তাঁর নাম হ'ল হেপওয়ার্থ (Cecil Hepworth : 1874-1953)। ম্যাজিক লণ্ঠন ব্যবসায়ীর পুত্র এই হেপওয়ার্থের তোলা 'Rescued by Rover' ছিল তদানিন্তন সময়ে সবচেয়ে জনপ্রিয় ছবি। ছবির প্রযোজক ছিলেন হেপওয়ার্থ নিজে এবং পরিচালনার দায়িত্ব দিয়েছিলেন ফিটজামনকে (L. Fitzhamon : 1869-1953)। এছাড়া তিনি ১৯১৩ সালে 'Hamlet', 'Cigarettemaker's Romance' ইত্যাদি জনপ্রিয় ছবিরও নির্মাতা ছিলেন।

ফ্রান্স

ফ্রান্সে চলচ্চিত্র-প্রসারে এর আগে আমরা ল্যুমিয়ের ভাইদের এবং জর্জ মেলিজের ভূমিকা সম্পর্কে জানতে পেরেছি। এছাড়া এদেশে চলচ্চিত্র শিল্পকে বিস্তৃত করার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল গ্যাম' (Leon Gaumont : 1864-1946) এবং পাথের (Charles Pathe : 1863-1957)।

গ্যাম'র কর্মজীবন শুরু হয়, Alexandre Eiffel এর (Eiffel Tower-এর নির্মাতা) সহকারী ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে। পরবর্তীকালে চলচ্চিত্র-শিল্পের প্রতি আগ্রহী হয়ে প্রতিষ্ঠা করেন 'Gaumont Studio'। তাঁর ব্যবসা ইংল্যাণ্ডেও বিস্তার লাভ করে। তাঁর প্রথম ছবির নাম 'Misadventures of a piece of veal'। ১৮৯৬ সালে তিনি তৈরি করেন ৬০ মিমি ক্যামেরা।

চার্লস্ পাথের স্বল্প পরিচিতি আমরা আগেই পেয়েছি। চলচ্চিত্রের ব্যবসায়িক সম্ভাবনায় আকৃষ্ট হয়ে তিনি ক্যামেরা তৈরি করে ফেলেন এবং ল্যুমিয়েরদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নেমে পড়েন। তাঁর প্রথম ছবি ছিল 'L' Arrivee d' Un Train en Gare de vincennes'। ভাইদের সাথে অংশীদারী সর্তে তৈরী হয় 'Pathe Brothers'। সমস্ত রকমের ছবি এখানে তৈরি হ'ত। ১৯০৮ সাল নাগাদ বলা

যায় পাথে ব্রাদার্সের ছবির চাহিদা ছিল প্রায় সারা বিশ্ব জুড়ে। তাঁদের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কাজ হ'ল 'Pathe Gazette' নামে সংবাদ চিত্রের প্রচলন।

সমসাময়িক অবস্থায় ফ্রান্সের চলচ্চিত্রে যাঁর নাম অবশ্যই উল্লেখযোগ্য, তিনি হলেন জেকা (Ferdinand Jecca : 1864-1947)। জেকা চলচ্চিত্রে আসেন পাথে ব্রাদার্সের সহযোগিতায়। পাথে ব্রাদার্সের স্টুডিওতে 'Vincennes'-এর পরিচালক হিসেবে নিয়োজিত হন। স্টুডিও থেকে বেরিয়ে গিয়ে বাস্তব জগতের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ক্যামেরাকে অনেক বেশী বিস্তৃত পটভূমিতে ব্যবহার করে তৎকালীন ফরাসী চলচ্চিত্রে এক স্বাতন্ত্র্যের নজির রাখেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য ছবি হ'ল, 'Passion de Notre Signeur Jesus Christ' (1902-5), 'Les Victimes de l' Alecootesme', 'L' Histoire' d' un Crime' ইত্যাদি।

ইটালী

ইটালীর ক্ষেত্রে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হ'ল এই যে লুমিয়েরদেরও আগে ক্যামেরা ও প্রক্ষেপণ যন্ত্রের পেটেন্ট গ্রহণ করেন আলবেরিনে (Fileteo Alberine)। সময়টা ছিল ১৯০৫ সালের নভেম্বর মাস। আলবেরিনের প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠান 'Cines' থেকেই ইতালীর প্রথম ছবি 'La Presa di Roma' (1905) নির্মিত হয়। ক্যামেরাম্যান Roberto Omega'র সাহায্যে হাতে আঁকা পশ্চাদ্‌ভূমির সামনে উন্মুক্ত প্রাঙ্গনে নির্মিত হয়েছিল এই ছবি।

১৯১২ সালে 'Cines'-এর তৈরি ছবি 'Cabiria' চলচ্চিত্র সম্পাদনার এবং চিত্রগ্রহণের ক্ষেত্রে (Dolly'র ব্যবহার) নতুন নজির সৃষ্টি করে।

এই সময়ে আর একজনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, তিনি হলেন পাসত্রোনে (Giovanni Pastrone : 1882-1959)। তাঁর উল্লেখযোগ্য ছবি হ'ল 'Napoleono' (1907), 'Giulio Cesare', 'Enrico III' (1909) এবং 'La Caduta di Troia' (1910)। এই ধরণের মহাকাব্যিক প্রযোজনার প্রভাব সমুদ্রপারের গ্রিফিথ এবং ডি'মিলকেও স্পর্শ করেছিল।

এরপর উল্লেখযোগ্য ছবি হিসেবে বলা যায় সোলডাটির (Mario Soldati—b. 1906) তৈরি 'L'assedio dell Alcazar' (1940) এবং 'Bengasi' (1942), মুসোলিনির সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসী নীতির স্বপক্ষে।

জার্মানী

জার্মানীতে প্রথম ছবি করেন 'Maltese Cross' এর উদ্ভাবক মেস্‌টার (Oskar Messter : 1866-1943)। ১৮৯৭ সাল থেকে তিনি নিজের উদ্ভাবিত যন্ত্রের সাহায্যে নিজেরই স্টুডিওতে তথ্যচিত্র নির্মাণ করতে থাকেন। খুব স্বল্প দৈর্ঘ্যের এই সমস্ত ছবিগুলো ছিল ঐতিহাসিক ঘটনার চলচ্চিত্রায়ণের প্রচেষ্টা। ১৯০০-১০ এই একটানা দশ বছর ধরে তিনি চলচ্চিত্র ও ফনোগ্রাফকে সম্মিলিত করার চেষ্টা চালিয়ে যান।

প্রকৃতপক্ষে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত জার্মানীতে চলচ্চিত্রের প্রসার ঘটেনি। ১৯১৩ সাল নাগাদ জার্মানীতে চলচ্চিত্র-শিল্পের গোড়াপত্তন হ'ল বলা যেতে পারে, যখন Max Mack তৈরি করলেন 'Dr. Jekyll & Mr. Hyde' গল্পের অনুসরণে 'Der Andere'। এই বছরই চলচ্চিত্রকে আরো একধাপ এগিয়ে দিল রাইয়ের (Stellan Rye) 'Der Student Von Prag'। এই ছবির প্রধান চরিত্রে অভিনয় করলেন Paul Wegener (1874 1948)। এই Wegener এবং Henrik Galeen (18 ? - 19 ?) ১৯১৫ সালে তৈরি করলেন 'Der golem' (1915)। এক্সপ্রেসেনিজ্‌ম্ ও রোমান্টিসিজ্‌ম্-এর সংমিশ্রণ ঘটল জার্মান ছবির শৈশব অবস্থাতেই।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর জার্মান সিনেমার দ্রুত অগ্রগতি হ'তে থাকে। ১৯২২ সালে প্রায় ৪৭৩ খানা ফিচার ছবি তৈরি হয় জার্মানীতে, যে সংখ্যা সমসাময়িক কালে অ্যামেরিকা ছাড়া অন্য কোথাও কল্পনাতীত ছিল। Robert Wiene, Carl Mayer এবং Hans Janowitz-এর সহযোগিতায় নির্মিত হ'ল 'The Cabinet of Dr. Caligari' (1920) ; যে ছবি জার্মানীতে সূচনা ক'রল নয়া-শিল্প-অভিব্যক্তিবাদের। ওই বছরই তৈরি হ'ল Karl Heinz Martin-এর হাতে 'From Morning to Midnight'। ১৯২২ সালে তৈরি হ'ল মুরনাও (Friederich Wilhelm Murnau : 1889-1931)

এর হাতে 'Nosferatu'র মত কালজয়ী চলচ্চিত্র। ফিৎল্যাঙ (Fritzlang : b.1890) এর হাতে তৈরি হ'ল 'The Last will of Dr. Mabuse', 'M', 'Metropolis' ইত্যাদি। এছাড়াও জার্মান চলচ্চিত্রে যাদের নাম উল্লেখ না করলে ইতিহাস অসম্পূর্ণ থেকে যাবে, তাঁরা হলেন, পাব্স্ট (G. W. Pabst : 1885-1967), জ্যুৎজি (Piel Jutzi : 1894-19 ?) ইত্যাদি।

অষ্ট্রিয়া

চলচ্চিত্র সম্ভাবনায় অস্ট্রিয়ার ভূমিকা সম্পর্কে আমরা ইতিপূর্বেই কিছু কিছু জানতে পেরেছি। এর মধ্যে স্ট্যাম্ফারের স্ট্রবোস্কোপ, উখাটিয়াসের প্রক্ষেপণযোগ্য স্ট্রবোস্কোপ বা 'Photographische Dialyt' চলচ্চিত্র প্রক্ষেপণের কার্যকরী প্রচেষ্টাকে যথেষ্ট সাহায্য করেছিল। ১৮৫৪ সালে পেতভালের Petzval lens তৈরির খবরও আমরা পেয়েছি।

তবে চলচ্চিত্র দেখার বাস্তবিক সূত্রপাত হয়, অন্যান্য ইউরোপীয় শহরগুলোর মতই এখানেও লুমিয়েরদের দ্বারা। সময়টা ছিল ১৮৯৬ সালের ২০শে মার্চ, ভিয়েনাতে।

এরপর ১৯০০ সালে Karl Juhasz প্রথম এক ভ্রাম্যমান চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর ব্যবসা শুরু করেন। ১৯০৩ সালে ভিয়েনাতেই 'Munstedt-Kino' নামে প্রথম সিনেমা-হল তৈরি হ'ল। মূলত বিদেশ থেকে (Charles Pathe-এর কাছ থেকে) ছবি এনে অস্ট্রিয়ার চলচ্চিত্র তার যাত্রা শুরু করে।

১৯০৬ সাল নাগাদ আলোকচিত্রশিল্পী Louis Kolm প্রথম তথ্যচিত্র তৈরি করার জন্য স্টুডিওর পত্তন করেন। তাঁরই 'Wipplingerstrasse-16'-এ প্রথম অষ্ট্রিয়ান কাহিনীচিত্র 'Step by Step' তৈরি হয় Heinz Hanus-এর পরিচালনায় ১৯০৮ সালে।

তবে চলচ্চিত্র সঠিকভাবে তার যাত্রা শুরু করে কোলোরাটের (Alexander Kolowrat : 1886-1927) হাত ধরে। ১৯১০ সালে তিনি ফ্রাউমবার্গে (Pfraumbergs) এবং ১৯১৪ সালে ভিয়েনাতে দু' খানা স্টুডিও তৈরী করেন। এই সময়কার উল্লেখযোগ্য ছবি হ'ল 'Viena

in War' 'Dream of an Austrian Reservist' (1915) 'Letter form a Dead Woman' (1917) এবং ইবসেনের নাটক অবলম্বনে 'Ghost' (1918).

স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া

অ্যান্‌শ্যুত্‌সের প্রভাব চলচ্চিত্র সম্ভাবনায় কতখানি গুরুত্বপূর্ণ ছিল তা আমরা যথাসময়ে জেনেছি। স্ক্যাণ্ডিনেভিয়াতে প্রথম চলচ্চিত্র প্রদর্শন হয় সুইডেনের মালমোতে (Malmo) ১৮৯৬ সালের ২৮শে জুন লুমিয়েরদের দ্বারা। সুইডেনে প্রস্তুত প্রথম ছবি 'Komische Begegnung' কিন্তু ছিল জার্মান প্রদর্শক ক্র্যাডানোস্কির (পৃঃ ৭৮) তৈরি। প্রথম সুইডিশ চিত্র নির্মাণের কৃতিত্ব ফ্লোরম্যানের (Earnest Florman : 1862-1952)। ১৮৯৭ সালে তিনি ছোট ছোট দু'টো প্রহসন চিত্র তৈরী করেন। তাদের নাম 'Byrakstugan' এবং 'En akrobat har otur। কিন্তু জাতীয় চলচ্চিত্র নির্মাণের ও ব্যাপক প্রচারের কৃতিত্ব অবশ্যই প্রাপ্য ম্যাগনুসনের (Charles Magnusson : 1878-1948)।

নির্বাক চলচ্চিত্রের স্বর্ণযুগ বলা যায় ১৯১৪-১৯২০ সাল পর্যন্ত। জোস্ট্রম (Victor Sjostrom : 1879-1960) এবং স্টিলার (Mauritz Stiller : 1883-1928) এর নেতৃত্বে যে সমস্ত চিত্র নির্মিত হয় সেগুলো কালজয়ী। উল্লেখযোগ্য ছবি হ'ল স্টিলারের 'Love and Journalism' (1916), 'Sir Arne's Treasure' (1919) ইত্যাদি। প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখা ভালো বিখ্যাত অভিনেত্রী Greta Garbo স্টিলারের আবিষ্কার। জোস্ট্রমের বিখ্যাত ছবিগুলোর মধ্যে রয়েছে ইবসেনের কাহিনী অবলম্বনে 'A Man there was' (1917), এছাড়া 'The Outlaw and His Wife' (1918) এর মতো ছবি, যাদের পরবর্তীকালে 'The Bread of Love' বা 'The Seventh Seal'-এর অনুপ্রেরণা হিসেবে গণ্য করা হয়।

১৯২০ সাল পর্যন্ত ডেনমার্কের চলচ্চিত্রে নিজস্বতা বলে কিছু ছিল না। ১৯১৪ সালে ম্যাডসেনের (Holger Madsen : 1878-1943) এর 'Opium Dreams' এবং 'The Spirits' (1914) ইত্যাদিতে রচনাশৈলীর কিছু স্বাতন্ত্র্য লক্ষ্য করা যায় বটে, তবে খুবই স্বল্পখ্যাত

অথচ সম্ভবত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চলচ্চিত্রকার হিসেবে ক্রিসটেনসেন (Benjamin Christensen : 1879-1959)-এর নাম অবশ্যই করতে হয়। তাঁর 'Mysterious X' (1913) এবং 'Witchcraft through the Ages' (1922) সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য কাজ।

পরবর্তীকালে ড্রেয়ার (Carl Theodor Dreyer : 1889-1953) 'Thou Shalt Honour Thy Wife' (1925) 'The Passion of Joan of Arc' (1928) ইত্যাদি কালজয়ী ছবি নির্মাণ করেন। পরবর্তীকালে এই সুইডেন থেকেই বার্গম্যান (Ingmar Bergman : b. 1918) পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ পরিচালকরূপে স্বীকৃতি পেয়েছেন।

স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান দেশগুলোর মধ্যে আমাদের নির্ধারিত সময়সীমায় নরওয়ে ও ফিনল্যাণ্ডের উল্লেখযোগ্য কোন ভূমিকা আমরা চলচ্চিত্রের পটভূমিকায় দেখতে পাই না।

রাশিয়া

সোভিয়েত সিনেমার প্রথম স্বর্ণযুগ বলা যেতে পারে ১৯২৫-৩০ সাল। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের দু'বছর বাদে সিনেমা শিল্পকে জাতীয়-করণ করা হয়। যদিও প্রায় দু'হাজার পূর্ণ দৈর্ঘ্যের কাহিনীচিত্র ১৯০৭-১৯১৭ সালের মধ্যে এদেশে নির্মিত হয়, তা ছিল ভীষণভাবে জার্মান, ফরাসী, বেলজিয়ান ও বৃটিশ ছবির দ্বারা প্রভাবিত এবং শৈল্পিক মূল্যে নগণ্য।

সোভিয়েত দেশে প্রথম চলচ্চিত্র প্রেক্ষাগৃহ নির্মিত হয় লুমিয়েরদের দ্বারা সেণ্ট-পিটার্সবার্গে (বর্তমান লেনিনগ্রাদ)। সময়টা ছিল ১৮৯৬ সালের মে মাস, জার দ্বিতীয় নিকোলাই-এর অভিষেকের ঠিক পরে। এই উৎসবের চিত্রগ্রহণের জন্য বহু বিদেশী সংস্থার প্রতিনিধিরা এখানে উপস্থিত হয়েছিলেন এবং এগুলোই ছিল এদেশে তোলা প্রথম চলচ্চিত্র। সেণ্ট পিটার্সবার্গে লুমিয়েরদের সিনেমাটোগ্রাফের এই সাফল্যের পর তাঁরা রাশিয়ার বিভিন্ন প্রদেশে বিজ্ঞানের নবতম আবিষ্কার প্রদর্শন করে বেড়াতে থাকেন। ১৯০৫ সালে জনসাধারণ 'Potemkin' বিদ্রোহের বাস্তব তথ্যচিত্র দেখতে পান যে বিষয়বস্তু পরবর্তীকালে আইজেনস্টাইনের হাতে সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিত্র হয়ে উঠেছিল। সোভিয়েত দেশে প্রথম

চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন এক ফরাসী কোম্পানী (Pathe Freres) Maurice Maitre-এর পরিচালনায় 'Cossacks of the Don' (1908)। বহু বিদেশী সংস্থা রাশিয়ার জনজীবনের চলচ্চিত্র জনসাধারণের সামনে উপস্থিত করলেও দেশী পরিচালকের আবির্ভাব ঘটে সেই ১৯০৭ সালে যখন ড্রানকভ্ (Alexander Drankov) প্রথম পুশকিনের 'Boris Godunov' নাটকের ছায়াচিত্র অংশত গ্রহণ করেন এবং ১৯১০ সালের মধ্যেই নিজেকে রাশিয়ার অন্যতম শক্তিশালী চলচ্চিত্রকার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হন। তাঁর নির্মিত বিখ্যাত ছবিগুলোর মধ্যে রয়েছে—'Stenka Razin', 'Bloody Fortnight', 'Thirsty for Love' ইত্যাদি।

সমসময়ে পরিচালক হিসেবে Yosef Yermoliev (1890-1962), Vasili Goncharov (1861-1915), Yevgeni Bauer (1865-1917), Alexander Volkov (1885-1942), Yakov Protozanov (1881-1945) এবং Vacovolod Meyerhold (1874-1942)-র নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

১৯২০ সাল থেকে বলা যেতে পারে রাশিয়ান চলচ্চিত্রের অস্তিত্ব শুধুমাত্র আপন দেশেই নয় পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও অনুভূত হতে শুরু করল। এই সময়ে তিনজন বিখ্যাত চলচ্চিত্রকারের নাম আমরা পাই যাঁরা চলচ্চিত্রের প্রয়োগাঙ্গিকে নতুন নতুন মাত্রা সংযুক্ত করতে লাগলেন। এঁদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি হ'লেন আইজেনস্টাইন (Sergei Mikhailovitch Eisenstein 1898-1948)।*

আইজেনস্টাইনের প্রথম ছবি 'Strike' তৈরি হয় ১৯২৪-২৫ সাল নাগাদ। গ্রিফিথের চলচ্চিত্র নির্মাণের সাথে যেমন ক্যামেরাম্যান বিজারের নাম ওতপ্রোতভাবে জড়িত, তেমনি আইজেনস্টাইনের শিল্পকর্মের সঙ্গে আরো দু'জনের নাম উল্লেখ না করলে নয়, তাঁরা হলেন ক্যামেরাম্যান টিসে (Edouard Tisse : 1897-1961) এবং সহ-পরিচালক আলেক্সজান্দ্রভ (Grigori Alexandrov : b. 1903)।

শুধুমাত্র মানবিক বক্তব্য বহনে নয়, প্রয়োগ নৈপুণ্যে পরিণত ও

---

* পুদভ্কিন (Vsevolod Illareonovitch Pudovkin : 1883-1953)
দোজেঙ্কো (Alexander Petrovitch Dovzhenko : 1894-1956)

অনুকরণীয় উপস্থাপনার গুণে আইজেনস্টাইন চিরকাল অমর হয়ে থাকবেন তাঁর 'Battleship Potemkin' (1925) 'The Old and the New '(The General Line, 1929) 'October', (1927) 'Alexander Nevsky' (1938) ইত্যাদি ছবিতে। আইজেনস্টাইনের উপস্থাপনার অন্যতম প্রধান বিশেষত্ব মন্তাজের সুপরিকল্পিত ব্যবহার। এ ক্ষেত্রে তাঁর মৌলিকত্ব অনস্বীকার্য। সমসাময়িককালে মন্তাজের ব্যবহার প্রসঙ্গে একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য। রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকে কেন্দ্র করে একই বিষয় নিয়ে আইজেনস্টাইন এবং পুদভ্‌কিন দু'টি ছবি তৈরি করেছিলেন।* আইজেনস্টাইন এবং পুদভ্‌কিন দুজনের ছবি সম্পাদনার রীতি এবং প্রয়োগবিদ্যার দিক থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র মাত্রার পরিচয় রাখে।

পুদভ্‌কিন তাঁর চলচ্চিত্র নির্মাণে সম্পাদনার রীতি সম্পর্কে বলেন---"That a scene is most effectively presented by linking together, a series of specially chosen details of the scene's action।" মন্তাজ রীতির স্বপক্ষে বা উপরোক্ত রীতির বিপক্ষে বলা হয়—'To build up an impression by simply adding together a series of details was only the most elementary application of film editing. Instead of linking shots in a smooth sequence, a proper film's continuity should proceed by a series of shocks ; that each cut should give rise to a conflict between the two shots being spliced and thereby create a fresh impression in the spectator's mind.' তুলনামূলক আলোচনা প্রসঙ্গে আইজেনস্টাইন বলেন : "If montage is to be compared with something, then a phalanx of montage-pieces, of shots should be compared to the series of explosions of an internal combustion engine, driving forward its automobile or tructor ; for, similarly, the dynamics of montage serve as impulses driving forward the total film."

* পুদভ্‌কিনের 'The End of St. Petersburg' এবং আইজেনস্টাইনের 'October'।

এই মন্তাজ ব্যবহারের ও সম্পাদনার মাধ্যমে চিত্রগ্রন্থন পদ্ধতি নিয়ে দুই যুগন্ধরের মতের মধ্যে বিস্তর ফারাক ও বিতর্ক আছে সত্য, তবু আইজেনস্টাইনের মন্তাজ ব্যবহারের আঙ্গিক স্বধর্মে দৃঢ় ও সূক্ষ্ম।

চলচ্চিত্রে আইজেনস্টাইনের এই প্রয়োগরীতি আজ পর্যন্ত অনতিক্রম্য রয়ে গেছে এবং এ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষারও অন্ত্য নেই।

পুদভ্কিনের বিখ্যাত ছবিগুলোর মধ্যে রয়েছে 'Mother' (1926), 'The End of St. 'Petersburg' (1927), 'The Heir to Ghengies Khan' এবং 'Storm Over Asia' (1928)।

দোভজেঙ্কোর বিখ্যাত ছবিগুলোর নাম হ'ল 'Zvenigora' (1928) 'Arsenal' (1929), 'Earth' (1930) ইত্যাদি।

এ ছাড়া কুলেশভ্ (Lev Kuleshov : b. 1899) এবং ভারটভের (Dziga Vertov : 1896-1954) নাম উল্লেখযোগ্য।

চেকোস্লোভাকিয়া

চেকোস্লোভাকিয়াতে চলচ্চিত্রের সূত্রপাত হয় Jan Krizenecky-এর হাতে। ১৮৯৮ সালে প্যারিস থেকে সিনেমাটোগ্রাফ মেশিন কিনে এনে তিনি প্রথম এদেশে চলচ্চিত্র তৈরি করলেন। ১৯১২ সাল থেকে বলা যেতে পারে পূর্ণ দৈর্ঘ্যের চলচ্চিত্র নির্মাণের শুরু। চলচ্চিত্রের উপকরণ হিসেবে লোকগাথা, উপকথা, নাচ গান ইত্যাদির প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। সমসাময়িক কালে উল্লেখযোগ্য পরিচালক হিসেবে Karel Lamac (1897-1952), Premysl Prazky (1893-1953), Gustav Machaty (1901-1953) ইত্যাদির নাম করা যায়।

পোল্যাণ্ড

পোল্যাণ্ডের চলচ্চিত্রের উপযোগী যন্ত্র নির্মাণের একটা ইতিহাস আগাগোড়াই রয়েছে। এদেশে প্রথম চলচ্চিত্র নির্মাণের সম্মান প্রাপ্য Kazimierz Proszynski নামে এক ইঞ্জিনিয়ারের। সময়টা ছিল ১৮৯৪ ৯৬ সাল নাগাদ। তবে বাস্তবিক চলচ্চিত্র নির্মাণ শিল্প গড়ে ওঠে ১৯০৮ সালে যখন তৈরী হ'ল প্রথম স্বল্প দৈর্ঘ্যের ফিচার ছবি 'Tony in Warshaw'। ১৯২০ সালে তৈরী হ'ল প্রথম স্টুডিও। নির্বাক যুগের

উল্লেখযোগ্য পরিচালক হিসেবে নাম করতে হয় Ryszard Ordynsky (1878-1953), Wiktor Bieganski (b. 1892) ইত্যাদি।

হাঙ্গেরী

১৮৯৬ সালে এদেশে প্রথম চলচ্চিত্রের প্রদর্শনী হয়। চলচ্চিত্র তৈরীর কাজ শুরু হয় ১৯১২ সাল নাগাদ। সমসাময়িক পরিচালক হিসেবে Alexander Korda (1893-1956)-র নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

যুগোস্লাভিয়া

অন্যান্য দেশের মত যুগোস্লাভিয়াতেও চলচ্চিত্রের পত্তন সেই লুমিয়েরদের সূত্রে। তবে এদেশে প্রথম চলচ্চিত্র তৈরি হয় Monaki নামে এবং আলোকচিত্র শিল্পীর হাতে। প্রথম পূর্ণ দৈর্ঘ্যের চলচ্চিত্র 'Karad-jordje' তৈরি হয় Jules Bairy'র দ্বারা ১৯১০ সালে।

সমসাময়িক কালের উল্লেখযোগ্য পরিচালক Mihailo Al. Popovic, Dragoljub Aleksic ইত্যাদি।

বুলগেরিয়া

১৮৯৭ সালে লুমিয়েরদের সিনেমাটোগ্রাফ এবং ১৯০৩ সালে Vla-dimir Petkov-এর বায়োস্কোপ দিয়ে এদেশে চলচ্চিত্রের যাত্রা শুরু। ১৯০৮ সালে প্রথম ক্যামেরা আমদানী হ'ল এবং প্রেক্ষাগৃহ তৈরি হ'ল। ১৯১২ সালে তোলা হ'ল বালকান যুদ্ধের ছবি। প্রথম কাহিনী চিত্র ছিল Vassil Guendov-এর পরিচালনায় 'The Bulgarian is gallant'।

জাপান

ভিটাস্কোপ ও সিনেমাটোগ্রাফ একই সাথে জাপানে নিয়ে পেঁছিল ১৮৯৭ সালে। প্রচণ্ড জনপ্রিয় হ'ল বিজ্ঞানের এই নবতম আবিষ্কার। ১৯০৩ সালে তৈরী হ'ল প্রথম প্রেক্ষাগৃহ। জাপানে নির্মিত প্রথম দিককার চলচ্চিত্রগুলোতে জনপ্রিয় কাবুকি নৃত্যের বিশেষ প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। চলচ্চিত্রের অগ্রগতিকে ব্যাহত করেছিল তদানীন্তন সময়ে বেন্শিদের (Benshi) ব্যবহার। বেন্শি বলতে বোঝায়, এমন একজন

ব্যক্তির ব্যবহার যিনি ছবি চলাকালীন ছবি দেখে দর্শকদের সামনে ধারা-বিবরণী দেওয়ার কাজ করে চলতেন।

ক্রমশ চলচ্চিত্রের আপন ভাষার প্রভাবে কিছু চিন্তাশীল পরিচালকের আবির্ভাব ঘটল যাঁরা বুঝলেন চলচ্চিত্র কোন সূত্রধরের উপর নির্ভরশীল নয়। প্রথম দিকে কিছু স্বল্প দৈর্ঘ্যের ছবি তৈরি হয়। সেগুলোতে যৌনতার প্রভাব বেশী লক্ষ্য করা যায়। প্রথম স্টুডিও তৈরি হয় টোকিওতে ১৯০৮ সালে। সমসাময়িক পরিচালক হিসেবে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি হলেন মেকিনো (Shozo Makino)। তাঁর হাতে তৈরি হয় তখনকার দিনের অত্যন্ত জনপ্রিয় ছবি 'The Loyal 47 Ronin' (1913)। এরপর তলস্তয়ের 'রেজারেকশন' অবলম্বনে ১৯১৪ সালে তৈরি হয় 'Katusha' এবং ১৯১৭ সালে তলস্তয়ের আরেকটি কাহিনী অবলম্বনে তৈরি হয় 'The Living Corpse' তানাকার (Eizo Tanaka) হাতে। ১৯১৭ সালে প্রথম কার্টুন ছবি তৈরি হয়।

পরবর্তীকালে মিজোগুচি (Kenji Mizoguchi : 1898-1956), ওজু (Yasujiro Ozu : 1903-1953) এবং কুরোসাওয়া (Akiro Kuro-sawa : b. 1910) চিত্রপরিচালক হিসবে জগৎ বিখ্যাত হন।

স্পেন

১৮৯৭ সাল থেকে স্পেনে চলচ্চিত্রের গোড়াপত্তন ঘটলেও উল্লেখযোগ্য ছবি তৈরি হয় রে (Florian Rey : 1894-1962)-এর হাতে ১৯২৯ সালে। ছবির নাম ছিল 'The Damned Village'। পরবর্তীকালে বিখ্যাত পরিচালক হিসেবে নাম করা যায় বুনুয়েলের (Luis Bunuel : b. 1900)। মাদ্রিদ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় তিনি ঘনিষ্ঠ হন সালভাদোর দালি ও লোরকার সঙ্গে। চলচ্চিত্রে প্রবেশ করেন ১৯২৬ সালে Jean Epsteinকে-'Mauprat' নির্মাণে সহায়তা করে। কবিতা লেখা এবং ছবি আঁকার প্রচণ্ড ব্যস্ততার মধ্যে থাকতে থাকতে অনুভব করতে লাগলেন তাঁর উপযুক্ত মাধ্যম চলচ্চিত্র। মার কাছ থেকে সামান্য অর্থ সাহায্য নিয়ে ১৯২৮ সালে সালভাদোর দালির সহযোগিতায় তৈরি করলেন 'Un Chien Andalou'। বুর্জোয়া চিন্তা বিরোধী চলচ্চিত্র হিসেবে এই ছবি শাশ্বত দৃষ্টান্ত স্থাপন করল।

গ্রীস

এদেশে প্রথম ছবি করেন Dimitris Gaziadis (1897-1953)। গাজিয়াদিস তাঁর ছবিতে একাধারে প্রযোজক, চিত্রনাট্যকার এবং পরিচালক ছিলেন। ছবিটি ছিল তথ্যচিত্র। নাম 'Greek Wonder' (1921)। ১৯২৭ সালে তৈরি হয় 'Prometheus Bound'। পরবর্তী পঁচিশ বছরে ৪৭টি ছবি তৈরি হলেও গ্রীস চলচ্চিত্র নির্মাণে কোন উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করতে পারেনি।

অস্ট্রেলিয়া

ভৌগলিক অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও চলচ্চিত্র নির্মাণের উৎসাহে অস্ট্রেলিয়া কার্পণ্য দেখায়নি। প্যারিসে লুমিয়েরদের চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর এক বছর বাদে, অর্থাৎ ১৮৯৬ সালে অগাস্ট মাসে মেলবোর্ণের অপেরা হাউস-এ ছবি দেখানো হয়। সেপ্টেম্বর মাসে লুমিয়েরদের ভ্রাম্যমান আলোকচিত্র শিল্পী Maurice Sestier ভারতবর্ষ থেকে এদেশে এসে পৌঁছন এবং সিড্‌নির কিছু প্রাকৃতিক দৃশ্য গ্রহণ করেন। প্রাচীনতম অস্ট্রেলিয়ান ছবিটিও তাঁরই তোলা। ছবিটি ছিল 'Melbourne Cup horse race'।

১৯০০ সালে J. H. Perry'র প্রযোজনায় তৈরি হয় 'Soldiers of the Cross'। ১৯০৬ সালে তৈরি হয় J. এবং N. Tait এর প্রযোজনায় 'The Story of the Kelly Gang'। এক ঘণ্টারও বেশী সময়ের এই ছবি পৃথিবীর প্রথম কাহিনী চিত্র কিনা এ নিয়ে বিতর্ক আছে।

সুইজারল্যাণ্ড

প্যারিসের সাথে সাথেই জেনেভাতে ১৮৯৬ সালে প্রথম চলচ্চিত্র প্রদর্শনী হয়। প্রায় সাথে সাথেই চলচ্চিত্র তৈরি করার কাজও শুরু হয়ে যায়। ছোট ছোট আঞ্চলিক বিষয়বস্তুই প্রথম দিককার চলচ্চিত্রের উপজীব্য বিষয় ছিল ('Zurcher Sechselauten' ইত্যাদি)। কাহিনী চিত্রের সূত্রপাত ঘটে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে। Robert Florey, Jean Choux-এর মতো লোকেরা পরিচালক হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে শুরু করেন। এই সময়ের উল্লেখযোগ্য ছবি 'The Birth of the Swiss Confederation' (1925)। পরবর্তীকালে চলচ্চিত্রে স্বকীয় যোগ্যতায় সুপ্রতিষ্ঠিত হন Charles Duvanel (b. 1906), Lazar Wechsler (b. 1896)।

চলচ্চিত্রে ধ্বনি

চলচ্চিত্রের বিভিন্ন আঙ্গিকে যা যা উন্নতি আমরা পরবর্তীকালে দেখতে পেলাম তার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হ'ল চলচ্চিত্রে ধ্বনির এবং রঙের সংযোজন। প্রাথমিক অবস্থায় ধ্বনি ব্যবহারের জন্য ডিকসন যে প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন তা প্রয়োগের দিক থেকে বিশেষ গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠতে পারেনি—এ ছাড়া নির্বাক চলচ্চিত্রের আকাশচুম্বি জনপ্রিয়তা চলচ্চিত্রে ধ্বনির প্রবেশকে কিছু অংশে বিলম্বিত করেছিল।

বহু বৈজ্ঞানিক চলচ্চিত্রের নির্বাকযুগে নিরলস পরিশ্রম চালিয়ে যাচ্ছিলেন, কিভাবে শব্দতরঙ্গকে আলোর মাত্রায় রূপান্তরিত করা যায়, ফিল্মের ওপরে তার প্রতিচ্ছবি গ্রহণ করা যায় এবং পুনরায় তার নিখুঁত প্রতিধ্বনি সৃষ্টি করা যায়, প্রক্ষিপ্ত চিত্রের সঙ্গে পূর্ণ সামঞ্জস্য সাধন করে ইত্যাদি ব্যাপার নিয়ে। এই প্রসঙ্গে Lee de Forest (1873-1953) নামে এক অ্যামেরিকান বৈজ্ঞানিকের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আমরা দেখতে পাই। ১৯০৬ সালে Audion Tube আবিষ্কার করে তিনি এই বিষয়ের প্রচেষ্টাকে বেশ কয়েকধাপ এগিয়ে নিয়ে যান।

জার্মানীতে Oskar Messter ১৯০৩-৪ সালে, Leon Gaumont ১৯০১ সালে ফ্রান্সে গবেষণা চালান। গ্যাঁমো ১৯১৩ সালে প্যারিসে এবং পরে অ্যামেরিকায় প্রদর্শন করেন তাঁর সবাক-চিত্র 'Film parlant'।

জার্মানীতে ১৯১৮ সালে Joseph Massolle, Hans Vogt এবং Dr. Josef Engl নামে তিন বৈজ্ঞানিক এই একই বিষয়ের উপরে নিরলস প্রচেষ্টা চালাচ্ছিলেন। এদের কাজকে প্রভাবিত করেছিল S. A. Berglund নামে সুইডিশ বৈজ্ঞানিক, E. A. Lauste নামে ফরাসী বৈজ্ঞানিকদের গবেষণা। এই Lauste-ই এডিসনের সঙ্গে দীর্ঘকাল এই বিষয়বস্তুর উপর কাজকর্ম করেন এবং ধ্বনি এবং চিত্রের এক সমন্বয়িত দৃষ্টান্ত তৈরি করেন। যদিও এটা ছিল খুব নিম্নমানের এবং অগ্রহণযোগ্য, তবু এ কথা স্বীকার করা উচিৎ যে Lauste এই বিষয়ের উপর আরো গবেষণা করার সুযোগ পাননি। Denes Von Mihaly নামে এক হাঙ্গেরিয়ান বৈজ্ঞানিকের নামও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

যে তিনজন জার্মান বৈজ্ঞানিক একত্রে কাজ করছিলেন তাঁদের পরিশ্রম কিছু অংশে সাফল্যলাভ করে এবং ১৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯২২ সালে তাঁরা তাঁদের গবেষণার ফলশ্রুতি জনসাধারণের সামনে দেখাতে সক্ষম হলেন। বার্লিন শহরের Alhambra থিয়েটারে দেখানো হ'ল কয়েকটি ছোট ছোট স্বল্পদৈর্ঘ্যের সবাক চিত্র 'Life in the Village' নাম দিয়ে। তাঁদের সংস্থার নাম হলো 'Tri-Ergon'।

অ্যামেরিকান বৈজ্ঞানিক ফরেস্ট, এই তিনজন জার্মান বৈজ্ঞানিকদেরই মত একই ধরনের সাফল্য লাভ করেন ১৯২৩ সালে। তিনি কয়েকটি ছবিও তৈরি করেন। কিন্তু সামান্য কয়েকটি থিয়েটারেই এদের প্রদর্শন ব্যবস্থার উপযোগী যন্ত্রপাতি ছিল। বিপুল অর্থ বিনিয়োগের জন্য অধিকাংশ প্রেক্ষাগৃহই এ ব্যাপারে ঔদাসীনতা প্রদর্শন করল। তবে একথাও স্বীকার করতে হবে যে ফরেষ্টের আবিষ্কার 'Phonofilm' চলচ্চিত্রে ধ্বনির ব্যবহারে মানুষের আবেগকে ঠিকমত নাড়া দিতে অক্ষম হ'ল, ফলত তেমন জনসমাদর পাওয়া গেলনা।

চলচ্চিত্র প্রযোজকরাও বিশেষ আগ্রহী হচ্ছিলেন না, যদিও তখনকার দিনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরিচালক গ্রিফিথও চলচ্চিত্রে ধ্বনির ব্যবহার করেছিলেন ১৯২১ সালে তাঁর 'Dream Street' ছবিতে। যথারীতি এর কথা জনগণ সহজেই ভুলে গিয়েছিল। ফলে 'Warner Brothers' যখন ওয়েস্টার্ন ইলেকট্রিক সিস্টেম ব্যবহারের অধিকার গ্রহণ করল চলচ্চিত্রে ধ্বনির ব্যবহার ব্যাপক করার জন্য, তখন জিনিসটা প্রায় জুয়া খেলার সামিল হয়ে উঠল। এই নতুন পদ্ধতির নাম হ'ল 'Vitaphone'। বৃহৎ মাপের রেকর্ড (Disc) এবং প্রক্ষেপণ যন্ত্রের সমন্বয়ে তৈরী হয়েছিল এই যন্ত্র। ছোট ছোট ছবিতে সংলাপ এবং সঙ্গীত গৃহীত হয়ে ওয়ার্নার ব্রাদার্সের প্রথম 'ভিটাফোন' চিত্রের প্রদর্শনী হ'ল ১৯২৬ সালের অগাস্ট মাসে। কিন্তু পূর্ণ দৈর্ঘ্যের চিত্র 'Don Juan'-এ শুধুমাত্র আবহসঙ্গীত এবং বিশিষ্ট ধ্বনির (Sound effect) ব্যবহার ছাড়া অন্য কিছু রইল না। 'ডন জুয়ান' দর্শক মনে কোন রকম আলোড়ন আনতে অক্ষম হলেও ওয়ার্নার ব্রাদার্স হাল ছাড়ল না। ১৯২৭ সালের ৬ই অক্টোবর নিউ-ইয়র্কে জনসাধারণের সামনে উপস্থাপিত হ'ল 'The Jazz Singer'। যদিও এই ছবি সবাক চিত্র হিসেবে প্রথম হবার গৌরব অর্জন করেছে, কিন্তু বাস্তবিক অর্থে প্রায়

পুরো ছবিটাই নির্মিত হয়েছিল নির্বাক চিত্র হিসেবে। চিত্রতারকা Al Jolson বলেছিলেন মাত্র কয়েক লাইনের সংলাপ। কিন্তু যে জিনিস জনমনে আলোড়ন তুলতে সক্ষম হ'ল তা হ'ল তাঁর গাওয়া গান।

অ্যামেরিকান চলচ্চিত্র জগতের অন্যতম প্রধান পুরুষ William Fox গোপনে তাঁর কলাকুশলীদের নিয়ে তুলনামূলক পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাচ্ছিলেন চলচ্চিত্র এবং ধ্বনি সংযুক্তির বিভিন্ন রকম প্রচলিত পদ্ধতিগুলো নিয়ে। জার্মান বৈজ্ঞানিকদের Tri-Ergon পদ্ধতি, জার্মানির বার্লিন শহরের আর এক বৈজ্ঞানিক Ernst Ruhmer এর পদ্ধতি, অ্যামেরিকার Theodore W. Case যিনি বেশ কয়েক বছর ফরেস্ট এর সাথে যুগ্ম গবেষণায় ছিলেন এবং পরে স্বাধীন গবেষণায় লিপ্ত হ'ন তাঁর পদ্ধতি, এগুলোই ফক্সের কাছে সবচেয়ে সম্ভাবনাময় বলে মনে হয়। ফক্স কেস এর পদ্ধতি কিনে নেন। এর আগে Tri-Ergon পদ্ধতি ব্যবহারের অধিকার কিনে নিয়েছিলেন সুইজারল্যাণ্ডের Sankt Gallen সংস্থার কাছ থেকে।

উল্লিখিত পদ্ধতিগুলোর সমন্বয়ে Fox Film Corporation তৈরী করলো 'Movietone'। মুভিটোনের ছবি প্রথম প্রদর্শিত হ'ল ১৯২৭ সালের জানুয়ারী মাসে। মূলত সংবাদচিত্র তৈরি হ'তে থাকল। হয়ত দর্শকদের Jazz Singerএর মতো আলোড়িত করতে পারলনা 'Movietone News', কিন্তু এটা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ হয়ে গেল যে রেকর্ড-চিত্র সমন্বয়ের (Phonographic Record System) চেয়ে ধ্বনির আলোকচিত্র পদ্ধতি (Photographic Sound Track) অনেকগুণে ভাল এবং গ্রহণযোগ্য। এটা ওয়ার্নার্স ব্রাদার্সকেও স্বীকার করতে হ'ল এবং তাঁরা আগেকার পদ্ধতি বাতিল করে দিলেন।

সবাক চলচ্চিত্র পেল জনসমাদর এবং ক্রমশ এগিয়ে চলল বিস্তৃত পটভূমির দিকে। ক্রমশ শব্দ, সংলাপ, সংগীত এবং ধ্বনির মননশীল ব্যবহার চলচ্চিত্রে সংযোজন করতে থাকল গুরুত্বপূর্ণ মাত্রা।

❀

ই. এ. লস্যাট্

ভিটাফোন
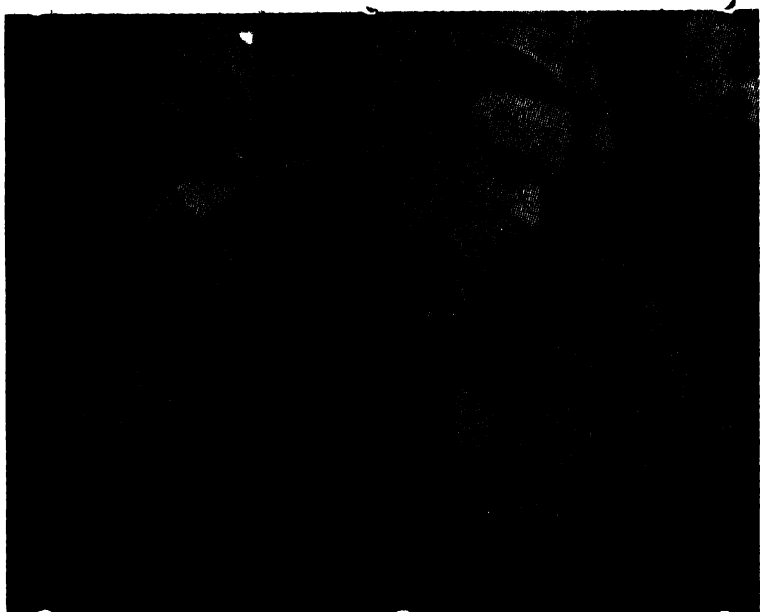
The Jazz Singer

চলচ্চিত্রে রঙের ব্যবহার

রঙীন চিত্র গ্রহণের কাজ শুরু হয় ১৮৬১ সালে ম্যাক্সওয়েলের (James Clerk Maxwell) হাতে। এরপর ১৯০৬ সালে স্মিথ 'Brighton School of Film Pioneers'-এ সাফল্যের সঙ্গে ফিল্ম-এ রঙ আনতে সক্ষম হলেন। তাঁর পদ্ধতিকে তিনি নাম দিলেন 'Kinemacolor'। স্মিথ ক্রমান্বয়ে লাল এবং সবুজ ফিল্টার ঘূর্ণায়মান অবস্থায় লেন্সের সামনে ব্যবহার করলেন। প্রক্ষেপণ যন্ত্র সাধারণ গতির চেয়ে সামান্য বেশী গতি নিয়ে চলেছিল সেকেণ্ডে ৩২ ফ্রেমের মত।

সবরকম রঙের পদ্ধতি, স্বাভাবিক রঙকে (natural colours) বিভাজিত করে প্রাথমিক রঙে (Primary Colours) এবং চিত্র গৃহীত হয় সেলুলয়েডে লাগান পৃথক পৃথক রঙীন আলোক সংবেদনশীল রাসায়নিক পদার্থের ওপরে এবং পুনরায় তাদের সংযোজন ঘটে প্রক্ষেপণের সময়ে। ম্যাক্সওয়েল এবং স্মিথ দুজনেরই পদ্ধতি ছিল যুগ্ম প্রক্রিয়ার (additive process) উপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ পর্দায় প্রক্ষিপ্ত ছবি তৈরি হ'ত বিভিন্ন রঙীন আলোর সমন্বয়ে। অনেক রকম পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়েছিল প্রাথমিক রঙগুলিকে চিত্রে সংরক্ষণের জন্য। এগুলির মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হ'ল (১) চিত্রগ্রহণের সময় বিভিন্ন রঙীন ফিল্টারের ব্যবহার, (২) একত্রে দু'টি ফিল্মের উপর দু'টি ভিন্ন রঙের ফিল্টার সমন্বিত লেন্সের মাধ্যমে একই ক্যামেরার সাহায্যে চিত্রগ্রহণ। (৩) ফিল্মের ওপরে অতি সূক্ষ্ম রঙের প্রতি সংবেদনশীল রাসায়নিক প্রলেপ ব্যবহার করে। সবচেয়ে সফল যুগ্ম প্রক্রিয়ায় নির্ভরশীল রঙীন চলচ্চিত্র তৈরি হয়েছিল ১৯২৫ সালে দুফের (Louis Dufay) দ্বারা। প্রথম পূর্ণ দৈর্ঘ্যের চলচ্চিত্রে এই পদ্ধতির ব্যবহার হ'ল। ছবির নাম ছিল 'Radio Parade' (১৯৩৪)। যদিও একথা অবশ্যই স্বীকার্য যুগ্ম প্রক্রিয়ায় বহু ত্রুটি-বিচ্যুতি ছিল এবং চিত্রের ঘনত্ব স্বাভাবিকের চেয়ে বেশী থাকায় প্রচলিত প্রক্ষেপণ-যন্ত্রের আলো এর জন্য যথেষ্ট ছিল না।

বিয়োগাত্মক পদ্ধতি (Substractive System) যুগ্ম-পদ্ধতির লাল-সবুজ এবং নীল এই তিন প্রাথমিক রঙের পরিপূরক রঙগুলিকে বিভাজিত করে চিত্রে সংরক্ষণ করে এবং তারপর, পর্দায় প্রক্ষেপণের সময় প্রক্ষেপণ যন্ত্রের তীব্র সাদা আলো থেকে পরিপূরক রঙগুলিকে একত্র করে রঙীন চিত্রের সৃষ্টি করে। ১৯১২ সালে প্রথম এই পদ্ধতির ব্যবহার হয়। যদিও প্রথম দিকে 'Technicolor' যুগ্ম পদ্ধতি গ্রহণ করে এবং 'The Gulf Between' নামে ছবি তৈরি করে ১৯১৭ সালে, কিন্তু ১৯২০ সাল থেকেই এই পদ্ধতি বাতিল করে বিয়োগাত্মক পদ্ধতি গ্রহণ করে। ১৯২২ সালে তৈরী হয় 'The Toll of the Sea' ছবি। এই পদ্ধতি ১৯২৯ সাল অবধি চালু ছিল। এমনকি প্রথম রঙীন সবাক চিত্র 'On With the Show' তৈরি হয় ১৯২৯ সালে এই পদ্ধতির উপর নির্ভর করে। যদিও এই সমস্ত রঙ বাস্তবানুগ ছিলনা, তবুও গ্রহণযোগ্য ছিল। ১৯৩০ সাল নাগাদ বলা যেতে পারে রঙ কিঞ্চিৎ স্বাভাবিকতা পেল আরো গবেষণার ফলশ্রুতি স্বরূপ। উন্নত ত্রিমাত্রিক বিয়োগাত্মক পদ্ধতির উপর নির্ভর করে তৈরি হ'ল ডিস্‌নির 'Flowers and Trees' ১৯৩২ সালে। বলা যেতে পারে এরপর থেকেই চলচ্চিত্রে রঙের ব্যবহার ক্রমশ বাণিজ্যিক ভাবে গৃহীত হ'ল।

চলচ্চিত্রে সঞ্চরণশীল রেখাচিত্র (Animation)

চলচ্চিত্রের ইতিহাস সন্ধানের সূত্র ধরে অতীতের দিকে তাকিয়ে আমরা দেখতে পেয়েছি যে চিত্রগ্রহণের পদ্ধতি (Photography) আবিষ্কারেরও বহুপূর্বে বিভিন্ন ধরণের ছায়াচিত্রের (Shadow play) প্রচলন ছিল সারা পৃথিবী জুড়ে বহু প্রাচীন যুগ থেকেই। সুতরাং চলচ্চিত্রের স্বাবলম্বন আসার শুরু থেকেই আবার যে এই বিষয়বস্তু নতুন ক'রে তার আসন সংরক্ষণের চেষ্টা করবে এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই।

১৮৭৬ সালে এমিল রেনডের 'প্র্যাক্সিনোস্কোপ' তার আগে ডিডেলিয়াম, ম্যাজিক লণ্ঠন ইত্যাদির কথা আমরা জেনেছি। ১৮৯২ সালে রেনড স্বচ্ছ তৈলাক্ত কাগজের ওপর ক্রমান্বয়িক চিত্র তৈরি করে ম্যাজিক লণ্ঠনের দ্বারা প্রক্ষেপণ করে প্যারিসের 'Optical Theatre'-এ প্রাত্যহিক প্রদর্শনের ব্যবস্থা করেন। তিনি এর নাম দিয়েছিলেন 'Crystalord'। ১৮৯৫ সালে লুমিয়েরদের 'সিনেমাটোগ্রাফ' আসার পূর্ব পর্যন্ত তাঁর 'Poor Pierrot' এবং 'A Clown and His Dogs' প্রচুর জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। দু'টো ছবিরই প্রক্ষেপণ কাল ছিল প্রায় ১৫ মিনিট করে।

ব্ল্যাকটন-এর নাম আমরা আগে পেয়েছি। এনারও আগে এডিসন কোম্পানীর এক অজ্ঞাত পরিচয় শিল্পীর নির্মিত একটি ছবি পাওয়া যায়। ১৯০৬ সালে ব্ল্যাকটন তৈরি করেন অ্যামেরিকান ভিটাগ্রাফ কোম্পানীর হয়ে 'Humorous Phases of Funny Faces'। সমসময়ে ম্যাকের (Winsor McCay) নাম উল্লেখযোগ্য। ফ্রান্সে কোহল (Emile Cohl) তাঁর 'Fantasmagorie', 'Un Drame chez les Fantoches' (1908) ইত্যাদি প্রাণবন্ত ছবির জন্য বিখ্যাত হয়ে আছেন। ম্যাকে অমর হয়ে আছেন 'Little Nemo' (1911), 'How a Mosquito Operates'

(1911) ইত্যাদি ছবিতে। তবে তাঁর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছবি বোধ হয় 'Gertie the Trained Dinosaur' (1913)। পরবর্তীকালে তাঁর যে ছবিকে অ্যানিমেশন ছবির ক্ষেত্রে দিকচিহ্ন বলা যেতে পারে সেই 'The Sinking of the Lusitania' মুক্তি পায় ১৫ই অগাস্ট ১৯১৮ সালে। তদানীন্তন সময়ে সংবাদপত্রের জনপ্রিয় কার্টুন চরিত্রদের নিয়ে 'অ্যানিমেশন' ছবি তৈরির প্রবণতা বিশেষ লক্ষ্য করা যায়। ম্যাকমানুসের (George McManus) 'Bringing up Father' হেরিমানের (George Herriman) 'Krazy Kat' ইত্যাদি উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে। সমসময়ে উল্লেখ-যোগ্য ব্যক্তি ব্রে (John R. Bray) 'Col. Heeza Liar in Africa' নামে জনপ্রিয় এক পর্যায় (series) তৈরি করেন। তিনি অ্যানিমেশন চিত্র গ্রহণের যান্ত্রিক উন্নতিরও চেষ্টা চালান এবং কতকগুলি উপায় উদ্ভাবন করেন (U. S. A. Patent Number 811615 January 14, 1914)। অ্যানিমেশনের যান্ত্রিক পদ্ধতির সবচেয়ে বেশী উন্নতিসাধন করেন হাড (Earl Hud) 'Cell' পদ্ধতি উদ্ভাবন করে (Patent No. 878091 dated June 15, 1915)।

১৯২৮ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর পৃথিবীর প্রথম সবাক কার্টুন ছবি মুক্তি পায় নিউইয়র্কের রক্সি থিয়েটারে। ছবির নাম 'Steamboat Willie', নির্মাতা ডিস্‌নি (Walt Disney : 1901-1953)। ১৯৩২ সালে কার্টুন চলচ্চিত্রে রঙ ব্যবহার করলেন 'Flowers and Trees' ছবিতে। পৃথিবীর প্রথম পূর্ণ দৈর্ঘ্যের (Feature length) কার্টুন ছবি তৈরি করেন ১৯৩৭ সালে। ছবির নাম ছিল 'Snow White and the Seven Dwarfs'। ডিস্‌নির ছবির জনপ্রিয়তা কার্টুন ছবি নির্মাণের ক্ষেত্রে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল।

একটা প্রচলিত ধারণা আছে ডিস্‌নি প্রথম রঙ্গীন কার্টুন ছবি নির্মাণ করেন, আসলে রঙের ক্ষেত্রে তাঁর ব্যবহৃত পদ্ধতি (Technicolor-Three Colour process) কার্টুন ছবিতে প্রথম ছিল। এর আগে ১৯৩০ সালে লান্‌জ (Walter Lantz) 'King of Jazz' ছবিতে প্রথম রঙ ব্যবহার করেন (Technicolor two colour process) এবং এসবাউ (Ted Esh-baugh) ১৯৩১ সালে তাঁর 'Goofy Goat' ছবিতেও রঙ ব্যবহার করেছিলেন (Multicolor process)।

জার্মান চলচ্চিত্রকার ফিসিংগার (Oscar Fischinger) চলে আসেন অ্যামেরিকাতে ১৯২৯ সালে। একেবারে ভিন্ন ধরণের মননে এবং বিশ্লেষণে তাঁর 'Brahm's Rhapsody' (1931) এবং 'Lichtertanz' (1932), কার্টুন চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে ভিন্নতর মাত্রা সংযোজন করে। এছাড়া বারটোস (Berthold Bartosch), মাসেরিল (Franz Masereel), আলেক্সিয়েফ (Alexandre Alexeieff) এবং তাঁর স্ত্রী পার্কার (Claire Parker), জার্মান চিত্র পরিচালিকা রাইনাইগার (Lotte Reiniger), নিউজিল্যাণ্ডের প্রতিভাবান চিত্রনির্মাতা লাই (Len Lye) বিভিন্ন সময়ে চলচ্চিত্রে অ্যানিমেশনকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছেন।